প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা

শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

উৎসর্গ

বাল্যে ও কৈশোরে
সুখে দুঃখে নিত্য-সহচর,
ভ্রাতৃবৎসল, কর্তব্যপরায়ণ,
সেচ-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক,
লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কীর্তিমান্
অগ্রজ
স্বর্গত সতীশচন্দ্র মজুমদারের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে
শোকসন্তপ্ত গ্রন্থকার কর্তৃক
এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য
নিবেদিত হইল

ভূমিকা

স্বর্গত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'বসু ইনস্টিটিউট' নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিবৎসর আচার্যদেবের স্মৃতিতে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। বিগত ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে আমি এই বক্তৃতা দিতে আহূত হই। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বিকাশ'। এই বক্তৃতা মুদ্রিত হওয়ার পর বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আমাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে আমি জানাই যে এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার অনুবাদ না করিয়া এ সম্বন্ধে আরও একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিলেই ভাল হয়। তাঁহারা সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু বিশেষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা প্রকার কার্যে ব্যস্ত থাকায় বহু দিন পর্যন্ত আমি প্রতিশ্রুত পুস্তিকাখানি লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার জন্য আমি বিশেষভাবে দুঃখিত ও লজ্জিত, এবং বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের নিকট আমার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

এই পুস্তিকা রচনার উদ্দেশ্য কি তাহা উপসংহারে বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। ইংরেজী ভাষায়ও ৺ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ব্যতীত আর কেহ ব্যাপকভাবে কোন এক-খানি গ্রন্থে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে হিন্দুর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। সুতরাং এই পুস্তিকায় যে পদে পদে ভুল ত্রুটি থাকিবে ইহা জানিয়াও আমি এই দুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর হইয়াছি। কারণ

একজন পথ না দেখাইলে অন্য কেহ হয়ত শীঘ্র ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন না।

এই গ্রন্থে আমার কোন মৌলিকত্বের দাবী নাই। আমি নানাস্থান হইতে সংকলন করিয়াছি মাত্র। আমি বৈজ্ঞানিক নহি, সুতরাং বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুদের পারদর্শিতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা অন্যের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হইয়াছে। এই ত্রুটি দূর করিতে হইলে যাহা করা আবশ্যক উপসংহারে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দের অনুবাদ বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। এ বিষয়ে শ্রীরাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা' অভিধানের পরিশিষ্টে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তিকায় যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

বিজ্ঞানের নানা বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ যদি এই গ্রন্থের ভুল ও ত্রুটির দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব।

নাগপুর
১লা বৈশাখ ১৩৬৩

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

১. উপক্রমণিকা

প্রাচীন ভারতে দর্শন ও অধ্যাত্মজ্ঞানের এত দূর উন্নতি হইয়াছিল এবং তাহার তুলনায় অন্যান্য কোন কোন বিভাগে ভারতবাসীর জ্ঞান এত কম প্রসার লাভ করিয়াছিল যে অনেক সময় আমরা ইহা অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়াই মনে করি। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অনেকেরই ধারণা যে বিজ্ঞান বলিলে আমরা এখন যাহা বুঝি সে সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে বিশেষ কোন চর্চা হয় নাই এবং বিজ্ঞানের জগতে তাহার কোন স্থান নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মনে এই ধারণা কতদূর দৃঢ়মূল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিশ বৎসর পূর্বে ফ্যারিংটন প্রাচীন যুগের বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোমের কথা আছে কিন্তু ভারতের নামোল্লেখ নাই।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতি কতদূর হইয়াছিল তাহার যথাযথ বিচার করিতে হইলে উল্লিখিত প্রাচীন সভ্য দেশের সহিত তুলনা করিতে হইবে,—অষ্টাদশ শতাব্দী ও তাহার পরবর্তী কালের ইউরোপের সঙ্গে নহে। এই কথাটি মনে রাখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রাচীন ভারতে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মূল্য ও পরিমাণ কোন দিক দিয়াই তাহা পূর্বোক্ত সভ্য দেশগুলির বৈজ্ঞানিক অবদানের তুলনায় হীন নহে।

এই দেশগুলির মধ্যে গ্রীস দেশেই বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। সুতরাং গ্রীসের সহিত প্রাচীন ভারতের তুলনা করিলে অন্য দেশের সহিত তুলনার প্রয়োজন হইবে না।

গ্রীস সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই বলিয়া গর্ব করিয়া থাকেন যে যে যুক্তিমূলক মনোবৃত্তি (rational attitude of mind) হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি তাহা গ্রীসই জগৎকে দান করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক অধিক। ইহার সহিত ভারতে প্রচলিত সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভরতা, অলৌকিক কাহিনী ও যুক্তিহীন ধর্মমতের প্রভাব, উদ্ভট কল্পনা দ্বারা প্রাকৃতিক স্বরূপ নির্ণয় প্রভৃতির তুলনা করিয়া ইউরোপীয়ানগণ বৈজ্ঞানিক জগতে গ্রীসের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতা সহজেই প্রতিপন্ন করেন।

কিন্তু এই তুলনার গোড়ায় বেশ একটু গলদ আছে। এক দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের সহিত অন্যদেশের নিকৃষ্টতম বস্তুর তুলনা করিলে যে দোষ হয় এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। যাঁহারা এই প্রকার তুলনা করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে দোষগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সবগুলিই গ্রীসেও ছিল। গ্রীসেও গোড়া হইতেই যুক্তিমূলক মনোবৃত্তির উদ্ভব হয় নাই, ঐ সকল আদিম ও অসংস্কৃত ভাবের মধ্য দিয়াই তাহা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আরও বিশেষভাবে স্মরণ করা কর্তব্য যে যুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির প্রভাব কোন কালেই এ গুলিকে দূরীভূত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা দূর করিতে হইলে এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক।

পণ্ডিতেরা বলেন যে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীসে বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। কিন্তু ঐ যুগেই গ্রীসে এলিউসিনিয়ান ও অর্ফিক উৎসব এবং আরও কত কুসংস্কার ও অলৌকিক বিশ্বাস ছিল ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই তাহা জানেন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী গ্রীসের স্বর্ণযুগ। এই যুগে গ্রীসের

জ্ঞানালোক পৃথিবীকে আলোকিত করিয়াছে। বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখা এই যুগেই জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতদের মতে এই যুগই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির চরম উন্নতির যুগ এবং এই যুগেই যুক্তি ও বিচার সংস্কারের স্থান অধিকার করিয়াছে। এথেন্স নগরী তখন গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র—এবং এই নগরীতে যে সকল সুধীবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল, আজ গ্রীক সভ্যতার যাহা কিছু গৌরব তাহা তাহাদেরই দান।

কিন্তু ঠিক এই যুগেই গ্রীক সভ্যতার আর একটা দিক দেখিতে পাই। গৌরবের উজ্জ্বল শিখা দেখিয়াই আমরা এত চমৎকৃত হই যে তাহার তলার অন্ধকারের দিকে আমরা দৃষ্টি দেই না। তাই গ্রীসের শতকরা নিরানব্বই জনের মনোবৃত্তি যে এ যুগেও যুক্তিমূলক ছিল না, জীর্ণ পুরাতন সংস্কারের চক্রেই আবর্তিত হইত তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি পরিষ্কার হইবে।

তখন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার অবস্থান দেখিয়া শুভক্ষণ নির্ণয় না করিলে এথেন্সে কোন শুভকার্য আরম্ভ করা হইত না, এমন কি যুদ্ধের ব্যাপারেও ঐ নিয়ম ছিল। পিলোপনিসিয়ান যুদ্ধ গ্রীসের ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলেই এথেন্সের গৌরবরবি অস্তমিত হয়। এই পরাজয়ের একটি প্রধান কারণ চন্দ্রগ্রহণ। যে সময় যাত্রা করিলে গ্রীক সৈন্য রক্ষা পাইত চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় সে সময়ে যাত্রা করা হইল না। বিলম্বের ফলে এথেন্সের সৈন্য প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। পেরিক্লিস তখন এথেন্সের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁহার বন্ধু অ্যানাক্সাগোরাস সূর্য ও চন্দ্র দেবতা নহেন এই কথা বলায় আদালতে অভিযুক্ত হইলেন। এথেন্সের গণপরিষদে এই মর্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল যে যাহারা প্রচলিত ধর্মমত ও সংস্কার না মানিবে, অথবা আকাশের গ্রহ উপগ্রহ সম্বন্ধে কোন

মত প্রচার করিবে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে শাসন পরিষদে অভিযোগ (impeachment) করা হইবে। প্রাচীন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র শাসিত নগরী এথেন্সের গণপরিষদ বিচার করিয়া অ্যানাক্সাগোরাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। তিনি বন্ধু পেরিক্লিসের সহায়তায় কোনমতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র এথেন্সে উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে জ্যোতিষবিত্থার পঠনপাঠন অর্ধশতাব্দী কাল যাবৎ নিষিদ্ধ ছিল। এই যুগেই প্রোটাগোরাস দেবতাদের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লেখায় অভিযুক্ত হইলেন। তিনি বিচারের পূর্বেই পলাইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থগুলি প্রকাশ্য স্থানে দগ্ধ করা হইল। গ্রীস যখন জ্ঞান বিজ্ঞানের নূতন আলোকে উদ্ভাসিত তখন সর্বশ্রেষ্ঠ মনস্বী সক্রেটিস গণপরিষদের বিচারে বিষপান করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার একমাত্র অপরাধ এই যে ধর্ম সম্বন্ধে তিনি প্রাচীন মত মানিতেন না, নূতন কথা বলিতেন।

এই সমুদয় আলোচনা করিলে বেশ বোঝা যায় যে কোন দেশে যুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির যথেষ্ট প্রভাব থাকিলেও জনসাধারণ এবং এমন কি উন্নত-সম্প্রদায়েরও অধিকাংশ লোক প্রাচীন সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের হাত এড়াইতে পারেন না। সুতরাং ভারতবর্ষে এইরূপ সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিচয় পাইলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে সেখানে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অভাব ছিল।

২. প্রাচীন হিন্দুগণের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি

অতঃপর ভারতে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির কি পরিচয় পাওয়া যায় তাহারই আলোচনা করিব। মিসর ও ব্যাবিলনে বৈজ্ঞানিক চর্চা

সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে এই সব দেশের লোক যে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত করিত তাহা দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ফলে বাহ্য জগতের অনেক পদার্থের অন্তর্নিহিত গুণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের সঠিক ধারণা ছিল। এই প্রকার ধারণা হইতেই প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। হয়ত ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের ফলে আমরা জানিতে পারিব যে তাহাদের ব্যবহারিক জ্ঞান উন্নতি লাভ করিয়া বিজ্ঞানের কোঠায় পৌঁছিয়াছিল। ভারতে সিন্ধুনদের উপত্যকায় ও অন্যান্য স্থানে যে সর্বপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধেও ঠিক উল্লিখিত মন্তব্য করা যায়। এই সমুদয় স্থানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, টিন এবং এই সব ধাতুর মিশ্রণে উৎপন্ন ব্রঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর প্রচুর ব্যবহার ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে ভারতীয়েরা খনি হইতে ধাতুর উদ্ধার ও তাহা কাজে লাগাইবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মোটামুটি জানিত। নানাবর্ণে চিত্রিত কাচের ন্যায় মসৃণ বাসনপত্র দেখিলে মনে হয় রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহাদের কিছু জ্ঞান ছিল। তাহারা সীসাঞ্জন (galena), সেরুসাইট (cerussite), হিঙ্গুল (cinnabar), শ্বেতসীসক (white lead), জিপ্‌সম (gypsum), চূণ প্রভৃতির ব্যবহার জানিত।

হারাপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি যে সমুদয় স্থানে এই প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোন লিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। কতকগুলি মুদ্রার উপরে অপরিচিত অক্ষরে লিখিত ছোট ছোট লিপি আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেহ তাহা পড়িতে পারে নাই। সুতরাং এই যুগে ভারতে যুক্তিমূলক মনোবৃত্তির প্রভাব ছিল কিনা তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ভারতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দৃশ্যমান জগতের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য জানিবার আন্তরিক আগ্রহ এবং কোনপ্রকার সংস্কারের বশবর্তী না হইয়া যুক্তি দ্বারা সেই রহস্য-ভেদের চেষ্টা—ইহাই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বিকাশের পরিচয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে এই প্রকার মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। কিরূপে এই জগতের সৃষ্টি হইল তাহা জানিবার আগ্রহে সূক্তকার প্রশ্ন করিতেছেন—"সৃষ্টির প্রারম্ভে কি ছিল? এই জগতের উপর কিসের আবরণ ছিল? কে ইহাকে আশ্রয় দিত? অতল সীমাহীন জলরাশিই কি ইহাকে ঢাকিয়া রাখিত?"

তারপর তিনি নিজেই উত্তর দিতেছেন "তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না; মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না; আকাশও ছিল না, পৃথিবীও ছিল না; দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। নিবিড় অন্ধকারে সমস্ত ঢাকা ছিল। আর ছিল অনন্ত সলিলরাশি। সৃষ্টির বীজ ছিল লুক্কায়িত। একদিন তাপ লাগিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়ার ফলে সৃষ্টির আরম্ভ হইল। প্রথমে ছিল কেবল একটি সত্তা, তাহা হইতেই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইল, তারপরে হইল দেবতাদের উৎপত্তি।" কিন্তু সূক্তকার এটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"ঐ যে আদিম অদ্বিতীয় সত্তা তিনি কোথা হইতে আসিলেন কে জানে? তাঁহার শক্তিতেই কি সৃষ্টি হইল, না, তিনি ছিলেন নিষ্ক্রিয়? সর্বোচ্চ স্বর্গের অধ্যক্ষ হয়ত ইহার উত্তর দিতে পারেন, হয়ত বা তিনিও জানেন না।" এই ধরণের আকুতি ঋগ্বেদে আরও আছে। ইহারই ফলে ঋগ্বেদে দেখিতে পাই—"চরম সত্য (সৎ—ইংরাজীতে যাহাকে বলে **ultimate reality**) এক, বিপ্রগণ তাহাকেই নানারূপে বর্ণনা করেন।"

গ্রীক দার্শনিক থেল্‌স বিশ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ

করিতেন ঋগ্বেদের সূক্তের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর একজন দার্শনিক অ্যানাক্‌সিম্যাণ্ডার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করেন তাহাই গ্রীক জগতে যুক্তিমূলক মনোবৃত্তির আদর্শ নমুনা বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু ঋগ্বেদের সৃষ্টি-সূক্ত এ দুয়ের অপেক্ষাই অধিকতর যুক্তিমূলক। ঋগ্বেদের 'চরম সত্য' অ্যানাকৃসিম্যাণ্ডারের 'অনন্ত' (unlimited) এবং পিথাগোরাসের 'মোনাড' এই দুয়ের সহিত তুলনীয়। কিন্তু উক্ত বৈদিক সূক্তগুলি যে খৃষ্ট-জন্মের অন্ততঃ সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। প্রকৃতির প্রপঞ্চ (phenomenon) সম্বন্ধে যুক্তির সাহায্যে অনুসন্ধান করার যে আগ্রহ বা প্রবৃত্তি হইতেই প্রকৃত বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়, উপরোক্ত গ্রীক দার্শনিক মত-গুলি সেই পর্যায়ে পড়ে ইহাই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত। যদি তাহাই হয় তবে গ্রীসের অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্বেই যে ভারতে অনুরূপ বিজ্ঞানচর্চার পূর্বাভাস পাওয়া যায় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

গ্রীসের ন্যায় ভারতেও পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি দুইটি বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। হিরাক্লিটাস ছিলেন সত্যের পূজারী। তিনি সত্য ছাড়া আর কিছু বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু তাঁহার মতে বাহিরের জগতে অনুসন্ধান করিলে সত্য মিলিবে না, সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে নিজের অন্তরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব—সুতরাং নিজের অন্তরে অনুসন্ধান করিলেই বিশ্বের পরিচয় পাইবে। ইহা হইতেই দর্শনের উৎপত্তি। ভারত যে এই পথে চলিয়া মনোজগতে কত দূর উন্নতি করিয়াছিল তাহা সর্বজন-বিদিত। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে, বিশ্বজগতের দিক দিয়াও গ্রীসের ন্যায় ভারতবর্ষ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। প্রাচীন সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনে জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সব মতবাদ দেখিতে পাওয়া

যায় তাহা প্রসিদ্ধ গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণের মতবাদের সহিত এক পর্যায়-ভুক্ত হইবার উপযুক্ত। গ্রীকগণের মতে অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা ও জল—এই কয়টি অপরিবর্তনশীল (immutable) মৌলিক উপাদান হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার সহিত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মূল উপাদানমূলক ভারতীয় মতবাদ সর্বথা তুলনীয়। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ডিমোক্রিটাস্ ও লিউকিপাস্ পরমাণু সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেন কণাদের মতবাদের সহিত তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য ও সঙ্গতি আছে। উক্ত দুইজন গ্রীক বৈজ্ঞানিক এবং অ্যানাক্সাগোরাস্ যে সমুদয় মত প্রচার করেন তাহার উল্লেখ করিয়া একজন মনস্বী লিখিয়াছেন 'প্রাচীন যুগে জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আর বেশীদূর অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ যে সমুদয় যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতির আরও অধিক পরীক্ষা সম্ভব নহে তাহা সে যুগে আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু গ্রীসের উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে যতটা অগ্রসর হইয়া-ছিলেন প্রাচীন ভারত যে, তাহা অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না—নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রই তাহা স্বীকার করিবেন। বরং ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ যথাযথ চর্চা করিলে প্রতীত হইবে যে এ দেশ কোন কোন বিষয়ে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে কণাদের তরঙ্গবাদের (undulatory theory) উল্লেখ করা যাইতে পারে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র উহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "সেই প্রাচীন যুগের এই অভিনব সিদ্ধান্ত যুগপৎ আমাদের মনে সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আলোক ও তাপ যে একই শক্তির বিভিন্নরূপ মাত্র—কণাদের এই আবিষ্কারও অত্যন্ত বিস্ময়কর। কণাদের পূর্বে কপিলও তাঁহার অনুরূপ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।" একজন মনস্বী বলিয়াছেন যে, বর্তমান যুগে যন্ত্রসাহায্যে নানা প্রকার পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রকল্প (hypothesis)

ও পরীক্ষা (experiment) দ্বারা বহু আয়াসের ফলে যে সমুদয় বৈজ্ঞানিক তথ্য নিরূপিত হইয়াছে হিরাক্লিটাস প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ কেবলমাত্র স্বজ্ঞা (intuition) দ্বারা বহু পূর্বেই তাহার নির্ণয় করিয়াছিলেন—ইহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না, এবং ইহার কোন ব্যাখ্যাও সহজসাধ্য নহে। কপিল ও কণাদ প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য।

এতক্ষণ পর্যন্ত হিরাক্লিটাস প্রভৃতি দ্বারা অনুসৃত যে দার্শনিক পথের আলোচনা হইল তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গ্রীসে জিনো প্রবর্তিত নূতন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তাঁহারা বলিলেন যে জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইল ইহাই মানুষের প্রধান সমস্যা নহে—জগতের সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান কিরূপে লাভ করা যায় ইহাই তাহার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহাই পূর্বোক্ত দ্বিতীয় মত ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পথ, এবং ইহা হইতেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। বাহ্য জগৎ অভিনিবেশসহকারে পর্যবেক্ষণ এবং তাহার উপাদানগুলির পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ, ইহাই এই নূতন পদ্ধতির ভিত্তি। ইহার ফলে গ্রীসে যে রীতি প্রবর্তিত হয় তাহা মোটামুটিভাবে এখনও প্রচলিত এবং ইহাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহার মূল কথা—বিশ্বজগতে যাহা আছে এবং ঘটিতেছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া তাহার রীতিমত শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ (analysis) ও সংশ্লেষণ (synthesis) ; তাহার সাহায্যে ও ব্যাখ্যাকল্পে সাধারণতত্ত্ব (general principles) উদ্ভাবনের চেষ্টা ; এবং এই সব তত্ত্বের সহিত পূর্বে জ্ঞাত ও স্বীকৃত তত্ত্বের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান।

এই পদ্ধতিগুলি (process) যে প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মনস্বী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নানা দৃষ্টান্তসহকারে

প্রাচীন ভারতে অনুসৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনার যে বিভিন্ন পদ্ধতির বিবরণ দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। এই পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায় তিনি নিম্নলিখিতরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেনঃ প্রত্যক্ষীকরণ (**perception**), পর্যবেক্ষণ (**observation**), পরীক্ষা (**experiment**), পর্যবেক্ষণের হেত্বাভাস (**fallacy of observation**), অনুমিতি (**inference**) এবং প্রকল্প (**hypothesis**)। তিনি আরও বলেন যে প্রাচীন ভারতীয়গণ কেবল যে এই পদ্ধতিগুলি জানিতেন তাহা নহে, ইহার প্রত্যেকটি সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে কি কি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে তাহাও বিশদ্‌ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

৩. বিজ্ঞানচর্চা

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, প্রাচীন ভারতে যে প্রাচীন গ্রীসের অপেক্ষা তাহা কম পরিমাণে বিদ্যমান ছিল না এতক্ষণ তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে প্রাচীন ভারত কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহারই আলোচনা করিব।

ক. জ্যোতিষ

জ্যোতিষ বিদ্যায়ই এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য চন্দ্র তারা প্রভৃতি যে দেবতা এবং তাহাদের গতিবিধি

অজ্ঞেয় রহস্যে আবৃত, আদিম মানবের এই সংস্কার পরিহার করিয়া আর্যগণ প্রাচীন ঋগ্বেদের যুগেই এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে সূর্যের বার্ষিক গতির সহিত দ্বাদশ অর সমন্বিত চক্রের তুলনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে দ্বাদশ রাশির চিহ্ন সম্বন্ধে তাঁহারা অভিজ্ঞ ছিলেন। সংহিতা যুগেই গগন পর্যবেক্ষণ ও সূর্য-চন্দ্রের গতি বিশ্লেষণের ফলে তাঁহারা ২৭টি তারামণ্ডল বা নক্ষত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সূর্যের বার্ষিক গতিই যে ঋতু পরিবর্তনের কারণ ইহাও তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন। সৌর বর্ষ, দ্বাদশ চান্দ্র মাস, এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর মল মাস ইত্যাদি গণনা বৈদিক যুগেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উক্তি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে ঋক্ সংহিতার যুগেই আর্যগণ জানিতেন যে পৃথিবী বর্তুলাকার (spherical) এবং শূন্যে অবস্থিত। শতপথ ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে 'পরিমণ্ডল' বলা হইয়াছে। পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধেও ঋক্ সংহিতায় আলোচনা করা হইয়াছে। দুই একজন আধুনিক পণ্ডিতের মতে পৃথিবীর আক্ষিক বিবর্তন (axial rotation) ও কক্ষ-গতি (orbital motion) যে সূর্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ঋক্ সংহিতার যুগে আর্যগণ তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। সূর্যের চতুর্দিকে যে পৃথিবী প্রতিবৎসরে একবার করিয়া ঘুরিয়া আসে, পণ্ডিতপ্রবর লাডউইগ বহু পূর্বেই দেখাইয়াছিলেন যে ঋক্ সংহিতায় তাহার উল্লেখ আছে।

ঋক্ সংহিতায় সূর্যের সপ্তরশ্মির উল্লেখ আছে। ইহা স্পষ্টতই সূর্যের রশ্মির সাতটি বিভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচায়ক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে সূর্যই বায়ু-প্রবাহের কারণ। এই গ্রন্থে সূর্যের উদয় ও অস্ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে বাস্তবিক সূর্য উদিত ও হন না অস্তও

যান না—আমরা যখন মনে করি সূর্য অস্ত গিয়াছেন তখন আমাদের দিক রাত্রি হইলেও অপর দিকে দিন হয়, আবার যখন মনে করি সূর্য উঠিয়াছেন তখন আমাদের দিন, অপর দিকে রাত্রি। ঋক্ সংহিতার একটি সূক্তেও এই জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে এরূপও বলা হইয়াছে যে সূর্যের অলৌকিক শক্তি দ্বারাই পৃথিবী ও আকাশের নক্ষত্র গ্রহমণ্ডল প্রভৃতি যথা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়।

লাডউইগ মনে করেন যে পৃথিবীর অক্ষ (axis) এবং ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) সহিত বিষুব রেখা যে কোণ গঠন করে (inclinations of the ecliptic with the equator) ঋক্ সংহিতায় এ উভয়েরই উল্লেখ আছে। আপাত-প্রতীয়মান সূর্যের বার্ষিক গতি দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যখন সূর্য উত্তর দিকে যান তখন উত্তরায়ণ এবং যখন দক্ষিণ দিকে যান তখন দক্ষিণায়ন। তিলক দেখাইয়াছেন যে শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে মহাবিষুব (vernal equinox) হইতেই উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। কিন্তু কৌষিতকী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে বর্তমান কালের ন্যায় মকরক্রান্তি (winter solstice) ও কর্কট ক্রান্তি (summer solstice) হইতেই এই দুই অয়নের আরম্ভ হয়। ঋক্ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে চন্দ্র সূর্য হইতে প্রতিফলিত আলোকেই দীপ্যমান। এই যুগে চন্দ্রের বিভিন্ন কলা এবং সূর্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ আর্যগণ ভালরূপেই বুঝিতেন এবং সম্ভবতঃ পাঁচটি গ্রহ তাঁহাদের জানা ছিল। শুক্র অথবা বেন (venus) এবং মন্থিন্ এই দুই গ্রহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ঋক্ সংহিতায় (১।১৬২।১৮) যজ্ঞাশ্বের ৩৪টি বংক্রী অথবা 'উভয় পার্শ্বাস্থি'র (ribs) উল্লেখ আছে। যজ্ঞাশ্ব গগনের প্রতীক—সুতরাং লাডউইগ অনুমান করেন যে ইহা দ্বারা সূর্য, চন্দ্র,

পঞ্চগ্রহ এবং ২৭টি নক্ষত্র সূচিত হইয়াছে। অনেকে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২৭টি নক্ষত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic) নক্ষত্রের সংখ্যানুযায়ী ২৭ ভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রতি মাসে চন্দ্র প্রত্যহ ইহার এক একটির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া আসিত। এই জন্যই তৈত্তিরীয় ও কাঠক সংহিতায় চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রের বিবাহ সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে।

অভিনিবেশ-সহকারে বহু পর্যবেক্ষণের ফলেই যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্বন্ধে আর্যগণ এইরূপ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, বৈদিক সাহিত্য হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি উক্তি হইতে বোঝা যায় যে প্রতিদিন সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী নক্ষত্রমণ্ডলীর উদয় ও অস্ত লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা সূর্যের গতি নির্ণয় করিতেন। তিলক এই উক্তিটির মূল্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ যে বৈদিক ঋষিগণ বিশেষ মনোযোগ-সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতেন তাহার বহু উল্লেখ আছে। ঋক্ সংহিতার কয়েকটি সূক্ত (৫।৪০।৫-৯) এ বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে বলা হইয়াছে যে যখন অসুরবংশীয় স্বর্ভানু সূর্যকে আঘাতের পর আঘাতে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং বিশ্ববাসীগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল তখন অত্রিঋষি তুরীয় দ্বারা আবিষ্কার করিলেন যে সূর্য অন্ধকারে আবৃত থাকায় তাঁহার আলো প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। ইহার ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে সূর্যগ্রহণের সময় তুরীয় নামক যন্ত্রদ্বারা ঋষি অত্রি গ্রহণের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন—অর্থাৎ তিনি বুঝিতে পারেন যে কোন অসুর সূর্যকে গ্রাস করে নাই, সূর্য অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়াছেন মাত্র। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ তুরীয় শব্দ 'চতুর্থ স্তব' এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু 'চতুর্থ স্তব' দ্বারা

সূর্যকে আবিষ্কার করা খুব সঙ্গত অর্থ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অর্থ যাহাই হউক আর্যগণ যে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ অতিশয় যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করিতেন, ইহার আরম্ভ, শেষ ও স্থিতিকাল নির্ণয় করিতেন, ও ইহার প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অথর্ব সংহিতায় বলা হইয়াছে যে রাহুর গ্রাসের ফলেই যে সূর্যগ্রহণ হয় ইহা লোক প্রচলিত মত মাত্র। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে চন্দ্রের ছায়ায় আবৃত হওয়াতেই যে সূর্যগ্রহণ হয় ঋক্ সংহিতার যুগেই এই জ্ঞানের সূত্রপাত হইয়াছিল।

সূর্য কোন নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় হইতে বিভিন্ন ঋতুর আরম্ভ গণনা করা হইত। বহু দিন পরে দেখা গেল যে একই ঋতুর আরম্ভকালে সূর্য ভিন্ন এক নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছেন। ইহা যে বহুদিনব্যাপী অক্লান্ত অধ্যবসায়সহকারে পর্যবেক্ষণ করার ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সময়ে মৃগশিরা নক্ষত্রে মহাবিষুব আরম্ভ হইত। কাল-ক্রমে ইহা কৃত্তিকায় সরিয়া গেল। সুতরাং এক সময়ে ইহা রোহিণী নক্ষত্রে আরম্ভ হইত। প্রজাপতি (মহাবিষুবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) স্বীয় কন্যা রোহিণীর অনুধাবন করিয়াছিলেন এই রূপকের মধ্য দিয়া ঐ তথ্য আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং বৈদিক যুগেই যে আর্যগণ বিষুবের অয়ন-চলন (**precession of the equinox**) সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়াছিলেন—ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে ধর্মানুষ্ঠান অর্থাৎ যজ্ঞাদির প্রয়োজনবশতঃ জ্যোতিষ বিদ্যার দিকেই বৈদিক আর্য-গণের দৃষ্টি সর্বপ্রথম বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং ঐ প্রাচীন যুগে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, দৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা এবং এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভের জন্য অভিনিবেশসহকারে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তি-

মূলক বিচার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা জানিতে হইলে জ্যোতিষবিদ্যার আলোচনাই সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য থাকে এবং সেই সব বিষয়ের মধ্য দিয়াই তাহাদের মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ম। সুতরাং বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষ বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও বিজ্ঞানচর্চা এই মানসিক উৎকর্ষেরই অংশ মাত্র। সুতরাং হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চার প্রসঙ্গে প্রথমেই এই জ্যোতিষ-বিদ্যার প্রসঙ্গে অবতারণা করা হইয়াছে।

ঋক্ সংহিতা বৈদিক যুগের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। ইহার রচনাকাল লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ ইহাকে খৃষ্ট-জন্মের তিন সহস্র বৎসর অথবা তাহারও পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করেন। বর্তমান যুগে অনেক পণ্ডিত ইহা স্বীকার করেন না। কিন্তু ইহা যে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে বা তাহার পূর্বে এবং অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি যথা-ক্রমে খৃষ্ট-জন্মের অন্ততঃ একহাজার ও আটশত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া-ছিল এ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ নাই।

বৈদিক যুগে জ্যোতিষবিদ্যার উন্নতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার অনেক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেই পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এই আলোচনার ফলে বৈদিক আর্যগণের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট ধারণা জন্মে তাহার মূল্যও কম নহে। তিন অথবা সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসর পূর্বে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার সম্বন্ধে আমরা ইহা হইতে যে ধারণা করিতে পারি, তাহার সহিত ঐ যুগের অন্যান্য প্রাচীন জাতির বিজ্ঞানচর্চার তুলনা করিলে এ সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুজাতির

স্থান কোথায় তাহার প্রকৃত নির্ণয় সম্ভবপর হইবে। দুঃখের বিষয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে গিয়াও এই দিক হইতে বিষয়টির আলোচনা করেন নাই। সেইজন্যই এত কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পরবর্তী যুগে জ্যোতিষ বিদ্যার আলোচনা এতদূর অগ্রসর হয় যে ইহার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এই যুগের রচনা। যজ্ঞের পুরোহিতগণের ব্যবহারের জন্যই ইহা প্রধানতঃ সঙ্কলিত হইয়াছিল। সুতরাং বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ বা গণনার উল্লেখ না করিয়া তাহার ফলাফল মাত্র এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রতি পাঁচ বৎসরে এক যুগ ধরিয়া লইয়া, প্রতি যুগের অন্তর্গত বর্ষ, মাস, মুহূর্ত, নক্ষত্রের উদয়, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দিন, ঋতু পরিবর্তন, বিষুব (equinox) ও অয়ন প্রভৃতির বিবরণ ইহাতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কর্কটক্রান্তি (summer solstice) ও মকরক্রান্তিতে (winter solstice) দিনের পরিমাণ ও এই উভয়ক্রান্তির ব্যবধান কত তাহাও এই গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে। এই গণনার উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ খৃষ্ট-জন্মের প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে রচিত। কিন্তু অনেকে এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে ইহার রচনাকাল খৃষ্ট জন্মের পূর্বে ছয়শত হইতে দুইশত বৎসরের মধ্যে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের গণনা অনুসারে প্রতিযুগে অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে সূর্য ও চন্দ্রের যথাক্রমে ৫, ও ৬ ৭ বার পূর্ণ আবর্তন হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ব্যতীত এই যুগের কোন কোন গ্রন্থে গ্রহের পশ্চাদগতি এবং গ্রহমণ্ডলের পরস্পর ও চন্দ্র-সূর্যের সহিত সংযোগের উল্লেখ আছে।

পরবর্তী যুগে অনেক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচিত হয়। এগুলি সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। বরাহমিহির প্রণীত ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’ গ্রন্থে পাঁচখানি প্রাচীন

সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এগুলির নাম পৈতামহ, বাশিষ্ঠ, পৌলিশ, সূর্য ও রোমক। প্রথম তিনখানি অনেকটা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুবর্তী। সূর্য সিদ্ধান্ত একটি কল্প বা যুগ নির্ণয় করিয়াছেন। সূর্য, চন্দ্র ও পঞ্চগ্রহের পূর্ণ আবর্তনকালের সর্বনিম্ন গুণিতক পূর্ণসংখ্যা (integral multiple) এই কল্প বা যুগের পরিমাণ। এই ভিত্তির উপরই সূর্যসিদ্ধান্তের জ্যোতিষিক গণনা প্রতিষ্ঠিত। এই সমুদয় সিদ্ধান্ত গুলিতে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের মধ্যক অবস্থিতি (mean position) নির্ণয় করিবার পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রকৃত অবস্থিতি (true position) নিরূপণ করিবার প্রণালীও নির্দেশ করা হইয়াছে। রোমক সিদ্ধান্ত সে রোমদেশের জ্যোতিষ গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতীয়গণ বিদেশীয়-গণের নিকট হইতে জ্ঞান অর্জন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে যবনেরা ম্লেচ্ছ হইলেও জ্যোতিষ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, সুতরাং প্রাচীন ঋষির ন্যায় পূজনীয়। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষ গ্রন্থে ব্যবহৃত কেন্দ্র, হারিজ, দ্রেক্কাণ, লিপ্ত প্রভৃতি গ্রীক কেন্ত্রস (kentros), অরিজস (orizos), দেকানস্ (dekanos), লেপ্তে (lepte) প্রভৃতি শব্দ হইতে গৃহীত। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুগণ যে গ্রীক ও রোমান জ্যোতিষ বিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে পাঁচখানি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হইল তাহার একখানিও আর এখন পাওয়া যায় না। এগুলি কোন যুগে এবং কাহার দ্বারা রচিত তাহাও জানিবার উপায় নাই। তবে বরাহমিহিরের পূর্বে এবং বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে এগুলি রচিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত

নহে। ইহাদের মধ্যে পৈতামহ সিদ্ধান্তই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, কারণ ইহার সহিত বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বেশি। ইহাতে বৎসরের পরিমাণ ৩৬৬ দিন ধরা হইয়াছে এবং প্রতি যুগে অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে দুইটি মলমাস যোগ করা হইয়াছে। ইহাতে নক্ষত্রের বিবরণ আছে, রাশির উল্লেখ নাই।

বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্তে জ্যোতিষের জ্ঞান আর একটু অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে নক্ষত্রের পরিবর্তে রাশির বিবরণ এবং লগ্নের আলোচনা আছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ষ-পরিমাণ ৩৬৫·২৫৯১ দিন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে— সুতরাং পৈতামহ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা ইহার গণনা অধিকতর শুদ্ধ।

পৌলিশ সিদ্ধান্তে সর্বপ্রথম চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের কাল নির্ণয় আলোচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মুসলমান লেখক আলবেরুণী লিখিয়াছেন যে এই সিদ্ধান্ত সুপ্রসিদ্ধ আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর পলাস নামক যবন লেখকের গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কেবল নাম-সাদৃশ্য ব্যতীত এই অনুমানের আর কোনও ভিত্তি নাই। পলাস ৩৭৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত কোন জ্যোতিষ গ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পৌলিশ এই নামটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। রোমক সিদ্ধান্তের কয়েকটি গণনায় গ্রীক প্রভাব বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এক যুগের পরিমাণ ২৮৫০ বৎসর। গ্রীক দেশীয় এথেন্সের জ্যোতিষী মেটনের স্বীকার্য (postulate) অনুসারে উনিশ বৎসরে সাতটি মলমাস থাকে। ১৯ এই সংখ্যাকে ১৫০ দিয়া গুণ করিয়াই উপরোক্ত যুগপরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তে দিবসের দৈর্ঘ্য ও কোণের (anomaly) পরিমাণ যথাক্রমে হিপার্কাস ও টলেমির মতের অনুবর্তী।

এই পঞ্চ সিদ্ধান্তের মধ্যে সূর্য সিদ্ধান্তই আর্যভটের পূর্ববর্তীকালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এবং সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইত। ইহাতে চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করার প্রণালী বিধিবদ্ধ আছে এবং গোলীয় জ্যোতিষের (spherical astronomy) অনেক সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে।

আর্যভটের সময়ই ভারতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা উন্নতির যুগ। তিনি ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩ বৎসর বয়সে আর্যভটীয় নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের গভীর সমুদ্রতলে খাঁটি ও ঝুটা অনেক মুক্তা ছিল, তিনি নিজের বুদ্ধিবলে তাহা হইতে বাছাই করিয়া প্রকৃত মুক্তাগুলি আহরণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ববর্তী শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা দ্বারা বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ইহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ মূল্যবান এবং বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য। ভারতীয় জ্যোতির্বিদের মধ্যে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী তাহার অক্ষের চারিদিকে ঘোরে। তিনিই প্রথমে ত্রিকোণমিতির সাইন (sine) আবিষ্কার করেন এবং জ্যোতিষিক গণনায় ইহার প্রয়োগ করেন। পর পর দুই দিনের দৈর্ঘ্যের ব্যবধান সঠিক নির্ণয় করার সূত্র (formula) তিনিই নির্ধারণ করেন। তিনি অপদূরকের (apse) সাহায্যে গ্রহের কক্ষ (orbit) নির্ণয়ের বিশুদ্ধ সমীকরণ (equation) আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করেন যে যদিও গ্রহগণ সমভাবে বৃত্তাকারে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করে, তথাপি তাহাদের গতি অসম বলিয়া মনে হয় কারণ তাহাদের ভ্রমণবৃত্তের কেন্দ্র ও পৃথিবীর কেন্দ্র বিভিন্ন। এ বিষয়ে গ্রহের গতি সম্বন্ধে গণনা করিয়া

তিনি যে সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন তাহার সহিত বর্তমান নির্ভুল গণনার প্রভেদ খুব বেশী নহে। ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) কোন এক বিন্দুর প্রকৃত উচ্চপাত (ascension) ও নিম্নপাত (declension) সম্বন্ধে তিনিই বিশুদ্ধ সমীকরণ (equation) করেন। চন্দ্রের কক্ষে (orbit) পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে তাহার ব্যাস-কোণের পরিমাণও তিনি আবিষ্কার করেন। তিনি আক্ষ দৃক্‌কর্ম ও আয়ন দৃক্‌কর্ম সম্বন্ধে নিয়ম প্রবর্তিত করেন। ইহার প্রথমটি মোটামুটি শুদ্ধ। গ্রহণের স্থায়িত্ব এবং চন্দ্রের কোন্ এবং কত অংশ ছায়ায় ঢাকা পড়িবে তাহার গণনার সূত্রও তিনি নির্ধারণ করেন। প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, তথাপি তিনি অকুণ্ঠচিত্তে প্রচার করিয়াছেন যে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের কারণ রাহু ও কেতুর গ্রাস নহে। চন্দ্রের গতিপথ পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা পড়িলে চন্দ্র গ্রহণ এবং সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে পড়িলে সূর্যগ্রহণ হয়। আর্যভটের মতে প্রতি বৎসরের দিন সংখ্যা ৩৬৫·২৫৮৬৮০৫। টলেমির গণনা (৩৬৫·২৬৩১৫৭৯) অপেক্ষা ইহা অধিকতর শুদ্ধ। সূর্যের অপভূর (apogee) দ্রাঘিমা (longitude) এবং চন্দ্রের পাতের (node) নাক্ষত্রকাল (sidereal) সম্বন্ধেও টলেমির গণনা অপেক্ষা আর্যভটের গণনা অধিকতর শুদ্ধ। জ্যোতিষবিদ্যা আর্যভটের প্রতিভায় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহার কতকটা ধারণা করা সম্ভবপর হইবে। দুঃখের বিষয় কিরূপ পরীক্ষা ও কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া আর্যভট এই সব দুরূহ সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন আমরা তাহা সম্যক অবগত নহি। ইহা জানিতে পারিলে প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক চর্চা সম্বন্ধে আরও নূতন তথ্য জানিতে পারা যাইত। আর্যভট যে জ্যোতির্বিদ-গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার আবিষ্কারের ফলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তাঁহার অনেক শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নিঃশঙ্ক, পাণ্ডুরঙ্গস্বামিন্ এবং লাটদেব অথবা লাটাচার্য সমধিক প্রসিদ্ধ। লাটদেব সর্বসিদ্ধান্তগুরু এই প্রশংসনীয় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

আর্যভট কর্তৃক চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বিরোধী মত প্রচারের বিষয়টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পরবর্তীকালেও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনেকে তাঁহার সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে আর্যভটের যুগে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও যুক্তি-মূলক বিচার প্রচলিত সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের উপর জয়লাভ করিয়াছিল। অপর পক্ষে ইহাও প্রমাণিত হয় যে সনাতন চিন্তাধারার পরিবর্তন কত দুরূহ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির দিক দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ স্বরূপ ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ভারতের সনাতনপন্থীগণ প্রাচীন এথেন্সবাসীর ন্যায় আর্যভটকে অধর্মাচরণের জন্য অভিযুক্ত করেন নাই এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা বন্ধ করেন নাই। প্রাচীন ভারতে চিন্তা ও গবেষণার সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। অনেকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি বেদের প্রামাণিকতা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সক্রেটিসের মতো কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই। পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্তনের সম্বন্ধে আর্যভটের মতের প্রতিধ্বনি করায় গেলিলিওকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে বলিতে হইবে আর্যভটের যুগের ভারতবর্ষ সপ্তদশ শতাব্দীর খৃষ্টীয় ইউরোপীয় সভ্যতার অপেক্ষা উন্নততর বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অধিকারী ছিল।

আর্যভটের জীবিতকালেই বরাহমিহিরের জন্ম হয় (৫০৫ খৃঃ অ)। যে সকল ধূমকেতু নির্দিষ্ট কাল অন্তর আবির্ভূত হয় বরাহমিহির তাহাদের কয়েকটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহাদের পুনরাবির্ভাবের

কাল, গতিপথ, কতদিন পর্যন্ত আকাশে তাহাদিগকে দেখা যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্দেশ করেন। কিন্তু বরাহমিহির নূতন তথ্য খুব বেশী আবিষ্কার না করিলেও ভারতের প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া আমাদের মহা উপকার করিয়াছেন। তাঁহার পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে পূর্বোক্ত প্রাচীন পাঁচখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তিনি এই সমুদয় এবং আর্যভট ও তাঁহার শিষ্য লাটদেব ব্যতীত সিংহাচার্য, প্রদ্যুম্ন ও বিজয় নন্দী প্রভৃতি আরও কয়েকজন জ্যোতির্বিদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সিংহাচার্য সম্বন্ধে আমরা কেবল এইটুকু জানি যে তিনি লঙ্কাদ্বীপে সূর্যোদয় হইতে দিবসের আরম্ভ গণনা করিতেন। প্রদ্যুম্ন মঙ্গল ও শনি গ্রহের গতিবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিজয় নন্দী বুধ গ্রহের সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করেন ও বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। খুব সম্ভবত ইহা প্রাচীন বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্তের নূতন সংস্করণ। প্রদ্যুম্ন ও বিজয় নন্দী আর্যভটের পূর্বে অথবা পরে ছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না। আর্যভটের পরে শ্রীষেণ ও বিষ্ণুচন্দ্র যথাক্রমে রোমক ও বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্তের নূতন সংস্করণ করেন।

ইহার পরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদ ছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত। তিনি ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত ও খণ্ডখাদ্যক নামে দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। আর্যভটের 'আর্ধরাত্রিক' রীতি* অবলম্বন করিয়া তিনি গ্রহগণের দ্রাঘিমা গণনার সহজ প্রণালী

---

*আর্যভট জ্যোতিষে 'ঔদয়িক' ও 'আর্ধরাত্রিক' এই দুই রীতির প্রবর্তন করেন। প্রথমটিতে লঙ্কাদ্বীপে সূর্যোদয়ের এবং দ্বিতীয়টিতে মধ্যরাত্রের মধ্যকাল (*mean time*) হইতে দিবস গণনার আরম্ভ হয়।

উদ্‌ভাবন করেন। অনেক স্থলে আর্যভটের গণনারীতির ভুল দেখাইয়া তিনি গ্রহগণের অপভূ (apogee) ও পাতের দ্রাঘিমা (longitude of the nodes) প্রভৃতি বিষয়ে আর্যভটের গণনা শুদ্ধ করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্তের নূতন আবিষ্কারের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। গ্রহগণের আহ্নিক গতির উপর 'মন্দ' ও 'শীঘ্র' এই দুই বৈষম্যের প্রভাব।

২। দ্রাঘিমা (longitude) ও অক্ষাংশের (latitude) লম্বন (parallax) সম্বন্ধে বিশুদ্ধ সমীকরণ (correct equations) নির্ণয়।

৩। যে কোনো দিনে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমের উল্লম্বে (verticals) সূর্যের উন্নতি (altitude) নির্ধারণ।

৪। দৃক্‌কর্মের আরও (অর্থাৎ আর্যভট অপেক্ষা) বিশুদ্ধ সমীকরণ।

৫। 'বলন' সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বিবরণ। পরবর্তী জ্যোতির্বিদ-গণ সকলেই ব্রহ্মগুপ্তের গণনা-প্রণালী ও গণনার ফল গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্তের পরে যে সকল জ্যোতির্বিদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভাস্করাচার্য সমধিক প্রসিদ্ধ। এ দুয়ের মধ্যে মঞ্জুল (৯৩২ খৃষ্টাব্দ) ও শ্রীপতি (১০৩৯ খৃষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। মঞ্জুল প্রণীত লঘু-মানস গ্রন্থে জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি সংক্ষেপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে এবং শ্রীপতির সিদ্ধান্তশেখর গ্রন্থে কয়েকটি নূতন তথ্য আছে।

ভাস্করাচার্য ১১১৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাই প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের শেষ প্রামাণিক গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ ও রচনাকৌশলে ইহা অদ্যাবধি জ্যোতিষ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে আদৃত হইয়া থাকে।

খ. শুল্ব বা জ্যামিতি

জ্যোতিষ বিদ্যার ন্যায় শুল্ববিদ্যাও যজ্ঞের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ যজ্ঞের বেদী নির্মাণ করিবার জন্য, বর্গ, আয়তক্ষেত্র (**rectangle**), ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি ঋজুরেখ (**rectilinear**) গঠন এবং তাহার পরিমাণ, ঘনমান (**volume**), প্রভৃতি গণনা করা আবশ্যক হইত। সমান্তরিক (**parallelogram**), রম্বস্, বৃত্ত ও উপবৃত্ত (**ellipse**) প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রচুর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আয়তক্ষেত্রের কর্ণের (**diagonal**) বর্গ যে উহার দুই ভুজের বর্গক্ষেত্রের পরিমাণের সমান ইহা প্রাচীন শুল্ববিদ্যার একটি প্রধান আবিষ্কার। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, গ্রীক পিথাগোরাস (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) এই তথ্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু গ্রীক গণিতশাস্ত্রের ঐতিহাসিক হিথ্ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নাই। অন্যান্য অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও এক্ষণে পিথাগোরাসকে ইহার আবিষ্কর্তা বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু বৌধায়ন শুল্বসূত্রে এই তথ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র ও শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন তৈত্তিরীয় সংহিতার রচনাকালেই এই আবিষ্কার হয়। সুতরাং এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব হিন্দুদের প্রাপ্য। কি প্রণালী অনুসারে তাঁহারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হইয়াছে—ইহার সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যে কোনো সংখ্যক সমান বর্গক্ষেত্রের পরিমাণ একত্র করিয়া একটি বর্গক্ষেত্র নির্মাণ করিবার প্রণালী কাত্যায়ন সূত্রে পাওয়া যায়। এইরূপ যে কোনো আয়তক্ষেত্রের সমপরিমাণ বর্গক্ষেত্রের গঠন প্রণালীও উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বৃত্ত, বর্তুল (**sphere**), শঙ্কু (**cone**),

পিরামিড প্রভৃতি ক্ষেত্রের আয়তন (area) ও ঘনমান (volume) নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

পরবর্তীকালে আর্যভট তাঁহার গ্রন্থে বৃত্ত ও ত্রিভুজের বিশেষত্ব (property) সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম চারি খণ্ডে যে সব উপপাদ্য (theorem) আছে তাহার প্রায় সবগুলিই হিন্দুদের জানা ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে রচিত কোনো গ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত আর্যভট যে সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা প্রাচীন জগতে প্রচলিত সমস্ত সংখ্যা হইতে অধিকতর শুদ্ধ। বর্তমান কালের গণনা ফলের সহিত নয়টি দশমিক সংখ্যা পর্যন্ত ইহা মিলে।

গ. পাটীগণিত (Arithmetic) বীজগণিত (Algebra) ও ত্রিকোণমিতি (Trigonometry)

বৈদিক যুগে আর্যগণ সংখ্যাগণিতে খুব উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীকেরা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ১০,০০০ (১০^{৪}) এবং রোমানেরা ১,০০০ (১০^{৩}) পর্যন্ত উর্ধ্ব সংখ্যা গণিতে পারিতেন, কিন্তু বৈদিক যুগে হিন্দুগণ পরার্ধ (১০^{১৪}) পর্যন্ত গণনা এবং ইহার নিম্নে যে কোন সংখ্যা সহজে ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেন। বৈদিক যুগেই দশের গুনিতক প্রচলিত ছিল—যথা, দশ, শত, সহস্র, নিযুত প্রভৃতি। এক সহস্রকে কি ভাবে তিন সমান ভাগে ভাগ করা যায় ইহা একটা বিশেষ সমস্যা ছিল এবং ঋক্ ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় ইন্দ্র ও বিষ্ণু ইহার সন্তোষজনক সমাধান করার জন্য প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। সংহিতা যুগেই সংখ্যার শ্রেণী (series) লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়া-

ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে ১, ৩, ৫ ; ১৯, ২৯, ৩৯...৯৯ প্রভৃতি এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় ৪, ৮, ১২...৪৮ এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ২৪, ৪৮, ৯৬, ...৪৯১৫২, ৯৮৩০৪, ১৯৬৬০৮, ৩৯৩২১৬ প্রভৃতি শ্রেণীর উল্লেখ আছে। এই সমুদয় শ্রেণীর যোগফল নিরূপণের কোনো প্রণালীও উদ্ভাবিত হইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে ২৪, ২৮, ৩২.. ৪৮ পর্যন্ত শ্রেণীর যোগফল ১৫৬ এবং বৃহদ্দেবতায় ২ + ৩ + ৪ + ...১০০০ = ৫০০৪৯৯ উল্লিখিত হইয়াছে। বৌধায়ন সূত্রে ইহার যে প্রণালী লিখিত হইয়াছে তাহাতে অনুমিত হয় যে নিম্নলিখিত সূত্র (formula) তখন জানা ছিল।

$$১+৩+৫+\cdots(২ক+১)=(ক+১)^২$$

ভগ্নাংশ এবং ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ শুল্ব সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা—

(১) $৭\frac{১}{২}\div\frac{১}{২৫}=১৮৭\frac{১}{২}$

(২) $(২\frac{২}{৭})^২+(\frac{১}{২}+\frac{১}{১২})(১-\frac{১}{৬})=৭\frac{১}{২}$

(৩) $\sqrt{৭\frac{১}{৯}}=২\frac{২}{৩}$

(৪) $৭\frac{১}{২}\div\frac{১}{১৫}$ এর $\frac{১}{২}=২২৫$

বেদের পরবর্তীযুগে ভারতে দশমিক অঙ্কপাতনের (decimal notation) আবিষ্কার হয়। পূর্বে ভারতে ও ভারতের বাহিরে সর্বত্র এখনকার মতো এক হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নে লিখিত হইত। কিন্তু ১০, ২০, ৩০ প্রভৃতি প্রত্যেকটি সংখ্যার পৃথক চিহ্ন ছিল। ইহার সহিত ১, ২ যোগ করিয়া মধ্যবর্তী সংখ্যা লিখিত হইত। আমরা যাহাকে রোমক সংখ্যা বলি তাহা এই পদ্ধতিতে লিখিত হয়। কিন্তু বর্তমান কালে সাধারণে প্রচলিত পদ্ধতিতে কেবলমাত্র ১ হইতে ৯ সংখ্যা ও শূন্য (অর্থাৎ ০) আছে। এই রীতি অনুসারে বাম দিকের প্রতি সংখ্যা দশ গুণ করিয়া বাড়িয়া যায়। যেমন ১০ এই সংখ্যায় ১ দশ গুণ

বাড়িয়াছে, ১০০ এই সংখ্যায় একের মূল্য শত গুণ বাড়িয়াছে। এই রকমে মাত্র ১ হইতে ৯ ও শূন্যের সাহায্যে যত বড় সংখ্যাই হউক অনায়াসে লেখা চলে। এই দশমিক অঙ্কপাতনের পদ্ধতি গণিতের জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুরাতন পদ্ধতিতে বড় কোনো সংখ্যা লেখাই যথেষ্ট কঠিন, সেগুলিকে যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ করা এক রকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ সংখ্যা লেখার এই নূতন দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হইলে বৈজ্ঞানিক জগতে যে উচ্চতর গবেষণা অসম্ভব হইত তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বোঝা যায়। সুতরাং সমস্ত জগৎ এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে।

এই নূতন পদ্ধতি ভারতে আবিষ্কৃত হয়। আর্যভট ইহার উল্লেখ করেন এবং ইহার সাহায্যে বর্তমান কালে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বর্গ-মূল ও ঘনমূল বাহির করিবার প্রণালী নির্দিষ্ট করেন। বরাহমিহির এই নূতন পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। ভারতবর্ষ হইতে আরব দেশে এই পদ্ধতি প্রচারিত হয়। আরবদের নিকট হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই পদ্ধতি শিক্ষা করেন। এই জন্য এই পদ্ধতি আরব সংখ্যা (**Arab numerals**) নামে পরিচিত। আরবদেশের পণ্ডিতেরা স্পষ্ট স্বীকার করেন যে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে এই পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি অল্পদিন পূর্বেও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত স্বীকার করিতেন না যে হিন্দুরা এই দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কারক। অবশ্য এমন সব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে এক বাতুল ভিন্ন আর কেহই একথা অস্বীকার করিতে পারে না যে দশমিক পদ্ধতিতে অঙ্ক লিখন হিন্দুদেরই সৃষ্টি।

ভাগ্যক্রমে প্রাচীন গ্রীস বা রোমে এই পদ্ধতির কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। নচেৎ ইউরোপীয় লেখকেরা নিশ্চিত দাবী করিতেন যে

ভারতবর্ষ ঐ সব দেশ হইতেই এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে। কিন্তু কোনো নিদর্শন না থাকিলেও অনেক স্থলে ইউরোপীয়েরা বিশ্বাস করেন যে গ্রীসে নিশ্চয়ই ইহা ছিল, এবং ভারতবাসী গ্রীস হইতেই ইহা শিখিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত 'সাইন' (sine) প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীস দেশে ইহার ব্যবহার ছিল না, কোনো গ্রীক পণ্ডিত ইহার উল্লেখ মাত্র করেন নাই। ভারতবর্ষে তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্য সিদ্ধান্তে রীতিমত 'সাইনের তালিকা' (table of sines) দেওয়া আছে, আরবগণ নিজেরাই স্বীকার করেন তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে ইহা শিক্ষা লাভ করেন, এবং আরবদের নিকট হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ইহার প্রচার হয়। এই সমুদয় সত্ত্বেও প্রাচীন গণিতশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিতপ্রবর পল ট্যানারী বলেন যে ইহা গ্রীসে প্রচলিত ছিল— যদিও হিপার্কস ইহার ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র কর্ডের (chord) তালিকা (table) দিয়াছেন। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে ট্যানারীর দল বিশ্বাস করিতে পারেন না যে ভারতবর্ষে গণিতশাস্ত্রে বড় কিছু আবিষ্কার হইতে পারে; ভারতে 'সাইন' ব্যবহৃত হইত সুতরাং গ্রীস হইতেই ভারতবাসীরা ইহা শিখিয়াছে ইহা তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধরূপেই গ্রহণ করিতেন। এই মনোবৃত্তির ফলেই ভারতে প্রাচীন বৈজ্ঞানিক চর্চা সম্বন্ধে ইউরোপের লোকেরা বিশেষ কিছুই জানে না। কারণ তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রাচীন যুগের যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সে সমস্তই গ্রাকদের কৃতিত্ব। গ্রীক 'রহস্য'ই (miracle) জগতের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূল উৎস। এই মনোবৃত্তি তিরোহিত না হইলে প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চর্চা সম্ভব নহে।

দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখন প্রণালী কবে প্রথম ভারতে আবিষ্কৃত হয় তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরেই ইহার বহুল প্রচলন দেখা যায় এবং ইহার সাহায্যে পাটীগণিতের প্রধান প্রধান ক্রিয়া (operation) গুলি অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ, বর্গমূল ও ঘনমূল নিরাকরণ, ভগ্নাংশ, সুদকষা, অনুপাত প্রভৃতি নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং কেহ কেহ অনুমান করেন যে পঞ্চম শতাব্দীর বহু পূর্বেই এই আবিষ্কার হয়। কিন্তু তাহা হইলেও পঞ্চম শতাব্দীতে এবং এমন কি তাহার পরেও যে প্রাচীন পদ্ধতি একেবারে লোপ পায় নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

বীজগণিতের মোট তথ্যগুলিও আর্যভট ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জানিতেন। তাঁহাদের রচনায় বীজগণিতের নিম্নলিখিত প্রধান ক্রিয়া গুলির পরিচয় পাওয়া যায়—(১) বর্ণমালা দ্বারা অজ্ঞাত রাশির নির্দেশ; (২) ধন (positive) ও ঋণ (negative) সংখ্যার গুণন ও ভাগ; (৩) ঘাত (power) ও সূচকের (exponent) ব্যবহার; (৪) সমীকরণের (equation) ব্যবহার। আর্যভট সরল (simple) ও দ্বিঘাত (quadratic) সমীকরণের সমাধান এবং প্রথম ডিগ্রীর অনির্ণীত (indeterminate) সমীকরণের সমাধান জানিতেন। ব্রহ্মগুপ্ত দ্বিতীয় ডিগ্রী পর্যন্ত জানিতেন। আর্যভট উদ্‌ঘাতন (involution) ও অবঘাতনের (evolution) নিয়মাবলী, সমান্তর শ্রেণী (arithmetic series) ও গুণান্তর শ্রেণী (geometric series), সরল সংখ্যা ও তাহার বর্গমূল এবং ঘনমূলের প্রগতি (progression) প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ত্রিকোণমিতিতেও হিন্দুরা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সাইন (sine) ও কোসাইনের (cosine) অপেক্ষক (function)

নির্ণয় করেন এবং সর্বপ্রথম তাহাদের তালিকা (table) প্রস্তুত করেন। গ্রীকেরা কর্ডের (chord) ব্যবহার করিতেন। কিন্তু হিন্দুরা অর্ধ কর্ডের ব্যবহার করিতেন। ক্যালকুলাস (calculus) পদ্ধতি তাঁহাদের জানা ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক উচ্চাঙ্গের তথ্য মঞ্জুল ও ভাস্করাচার্যের গ্রন্থে পাওয়া যায়। মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে গণিতশাস্ত্রে হিন্দুরা যে উন্নতি দেখাইয়াছেন প্রাচীন যুগে অন্য কোনও জাতি তাহা পারে নাই।

পেশোয়ারের নিকটবর্তী বকশালী গ্রামে একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহা গণিত বিষয়ক গ্রন্থ এবং ইহাতে বীজগণিতের ও পাটীগণিতের সাধারণ নিয়মগুলি (ভগ্নাংশ, বর্গমূল, সমান্তর ও গুণান্তর শ্রেণী প্রভৃতি) ছাড়াও জটিল (complex) শ্রেণীর সংকলন, একঘাত সহসমীকরণ (simultaneous linear equation), অনির্ণীত (indeterminate) দ্বিতীয় ডিগ্রীর সমীকরণ, এবং পূর্ণসংখ্যাদ্বারা যাহার বর্গমূল নির্দেশ করা যায় না সেই সব সংখ্যার বর্গমূল নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

পুঁথিখানি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুয়ের মিশ্রিত ভাষায় রচিত বলিয়া ইহা চতুর্থ খৃষ্টাব্দের পূর্বেকার রচনা বলিয়াই মনে হয়। দুঃখের বিষয় পুঁথিখানি খণ্ডিত এবং ইহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছে। আর্যভটের পূর্ববর্তী যুগে গণিতশাস্ত্র কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল এই পুথি হইতে তাহা অনেকটা বোঝা যায়। এই পুথিতে দশমিক অঙ্কপাতন ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা মূল গ্রন্থে ছিল অথবা পরবর্তীকালে লিখিত এই পুঁথিতে পুরাতন পদ্ধতিতে লিখিত সংখ্যা নূতন পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা স্থির করা কঠিন।

ঘ. আয়ুর্বেদ

প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক চর্চার ইতিহাসে জ্যোতিষ ও অন্যান্য গণিতশাস্ত্রের পরেই আয়ুর্বেদের স্থান। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের তুলনায় আয়ুর্বেদ অত্যন্ত হীনপ্রভ, এমন কি ইহার কোনো প্রকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা তাহাও অনেকে সন্দেহ করেন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণ যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি লইয়াই এই বিদ্যা অনুশীলন করিতেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে চরকসংহিতার একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে যুগে বেদ অপৌরুষেয় ও আপ্তবাক্য বলিয়া পূজিত হইত সেই যুগে উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে: "বেদ আপ্তাগম, কিন্তু পর্যবেক্ষণ ও প্রক্রিয়া (experiment) দ্বারা নির্ণীত যে সমুদয় সিদ্ধান্ত পণ্ডিতেরা পরীক্ষান্তে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও আপ্তাগমের তুল্য।"

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পঠন পাঠনে যে এই রীতি খুব প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ফলে বৈদিক যুগ হইতেই এ সম্বন্ধে স্বাধীন গবেষণা হয়। যে ত্রিদোষ তত্ত্বের উপর সমগ্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত কেহ কেহ মনে করেন যে তাহা বৈদিক যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অথর্ব সংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভেষজ (medicine), শল্য (surgery) ও স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

পরবর্তী যুগে আয়ুর্বেদ স্বতন্ত্র বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হয় এবং এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। এই সমুদয় প্রাচীন গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না—কিন্তু পরবর্তী কালের গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ আছে।

ত্রিপিটক নামক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ-সংগ্রহে গৌতম বুদ্ধের জীবিতকালে আয়ুর্বেদের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পালি বিনয় পিটকে এবং মূলসর্বাস্তিবাদ বিনয় পিটকের অন্তর্গত সংস্কৃত ভাষায় রচিত চীবরবস্তু খণ্ডে বুদ্ধের সমসাময়িক জীবক নামে একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা প্রাচীন আয়ুর্বেদের অত্যন্ত মূল্যবান উপকরণ। ইহা বুদ্ধের সমকালেয় পরিচায়ক না হইলেও অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর অবস্থা জ্ঞাপন করে। এই বিস্তৃত বিবরণীর সারমর্ম দেওয়াও এখানে সম্ভবপর নহে, কেবল কয়েকটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করিব।

জীবক মগধের রাজা বিম্বিসারের জারজ পুত্র ছিলেন। প্রাচীন তক্ষশিলা নগরীতে (পঞ্জাবের রাওলপিণ্ডির নিকট) প্রসিদ্ধ বৈদ্য আত্রেয়ের নিকট তিনি বৈদ্যক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নকালে জীবক ও তাঁহার সতীর্থগণ গুরুর আদেশে নিকটবর্তী পর্বত ও অরণ্যে যাইয়া সে সমুদয় বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতির কোনো প্রকার ভৈষজ ধর্ম (medicinal property) আছে তাহা সংগ্রহ করিতেন। জীবক এমন অনেক নূতন উদ্ভিদ আনিতেন সাধারণতঃ বৈদ্যশাস্ত্রে যাহার কোনো ব্যবহার ছিল না। জীবক গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রত্যেকটির গুণাবলী ব্যাখ্যা করিতেন। অবশেষে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গুরু জীবকের হস্তে একখানি কোদালি দিয়া বলিলেন, 'বৎস, ইহা লইয়া তক্ষশিলার চারিদিকে যোজন পর্যন্ত অনুসন্ধান কর এবং এমন সকল উদ্ভিদ্ সংগ্রহ করিয়া আন যাহার কোনোপ্রকার ভৈষজ ধর্ম নাই।' বহুদিন বহুক্লেশ সহকারে চারিদিক যথাসাধ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবক ক্ষুণ্ণ মনে শূন্য হস্তে গুরুর নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন যে তিনি এমন কোনো উদ্ভিদ্ দেখিতে পাইলেন না যাহার কোনপ্রকার ভৈষজ ধর্ম নাই। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইয়াছে, তুমি এবার দেশে ফিরিয়া যাও।"

তক্ষশিলা হইতে পাটলিপুত্র (পাটনা) বহু দূর। পথে চলিতে চলিতে জীবক বহু পীড়িতের চিকিৎসা করিলেন। এই সমুদয় পীড়ার উপসর্গের যে বিস্তারিত বিবরণ আছে তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে ব্যবহারিক বৈদ্যশাস্ত্রে পর্যবেক্ষণ এবং তাহার ফলে সাধারণ নীতির উদ্‌ভাবন (generalisation) বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীনযুগের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস লিখিতে গিয়া ফ্যারিংটন গ্রীক বৈদ্য হিপোক্রাটিসের লিখিত (খৃঃ পূঃ ৪৭০-৩৭০) বিভিন্ন পীড়ার বিবরণ সংগ্রহের (collection of case histories) ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু চীবরবস্তুর এই বিবরণ তাহা অপেক্ষাও বিস্তৃত এবং অধিকতর শিক্ষাপ্রদ। ফ্যারিংটন লিখিয়াছেন যে গ্রীসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখা এবং তরল খাদ্য দেওয়াই একমাত্র চিকিৎসা প্রণালী ছিল। কিন্তু চীবরবস্তুতে বর্ণিত জীবকের চিকিৎসা প্রণালী ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নতশ্রেণীর। ফ্যারিংটন গর্বের সহিত লিখিয়াছেন যে ব্যারাম পীড়া যে আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক ব্যাপার নহে, গ্রীকেরা ইহা প্রচার করিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করেন। কিন্তু জীবকও প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যেই রোগের কারণ নির্ণয় করিতেন, এবং তাহার বহু পূর্ব হইতেই, এমন কি বৈদিক যুগেও, যে স্বাভাবিক কারণ হইতেই রোগের উৎপত্তি হয় এই ধারণা ভারতে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

জীবক শল্যশাস্ত্রে (surgery) বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং রোগীর শরীরের নানাস্থানে তৎকর্তৃক যে সমুদয় অস্ত্রোপচারের কাহিনী চীবরবস্তুতে বর্ণিত আছে তাহা অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়। রোগীর মাথার চর্ম কাটিয়া ক্ষতস্থানের দুইধারের অংশ ফাঁক করিয়া কীট বাহির করা, রোগীকে স্তম্ভে বন্ধন পূর্বক উদরে অস্ত্র করিয়া, দূষিত অন্ত্র

(intestine) বাহির করিয়া, তাহা পুনরায় সুবিন্যস্ত করিয়া যথাস্থানে ভরিয়া, উদরের চর্ম সেলাই করিয়া তাহাতে প্রলেপ লাগান ইত্যাদি। এ সমুদয় কাহিনী কতদূর প্রকৃত তাহা বলা যায় না, কিন্তু কাল্পনিক হইলেও ইহা হইতে শল্যশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং এ সম্বন্ধে ধারণা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এ বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্তও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একবার রাজার শরীরে একটা উৎকট বেদনা হয়; তাহার কারণও নির্ণয় করা যায় না, উপশমও হয় না। জীবক অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ প্রকার পীড়াগ্রস্ত আর একটি রোগী খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং ইহার ফলে তাহার মৃত্যু হইলে, মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলেন যে, দুইটি কীটই এই যন্ত্রণার কারণ। তখন নানারূপ পরীক্ষার পর দেখিলেন পলাণ্ডুর রস লাগিলে ঐ কীট দুইটি মরিয়া গেল। তখন তিনি রাজাকে পলাণ্ডুর রস সেবন করাইয়া আরোগ্য করিলেন। ভারতের প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চর্চায় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, এবং পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ, প্রক্রিয়া, পরীক্ষা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কতদূর কার্যকরী ছিল জীবকের কাহিনী হইতে আমরা তাহা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি।

সুতরাং ভারতের আয়ুর্বেদ যে প্রাচীন যুগে সর্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং আরবজাতি যে এদেশ হইতে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইউরোপে ছড়াইয়াছিল ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এই শাস্ত্রের বিশেষ বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই কারণ ইহা এখন যে অবস্থায় আছে হিন্দুযুগেও তাহাই ছিল— নূতন বিশেষ কিছু যোগ হয় নাই।

আয়ুর্বেদ গ্রন্থের মধ্যে চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার পূর্বেও অনেক গ্রন্থ ছিল কিন্তু সে সমুদয় লুপ্ত

হইয়াছে। চরক কনিষ্কের সভায় ছিলেন এরূপ কিংবদন্তী আছে। মূল চরক সংহিতা কবে রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ; সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহা অনেকটা বর্তমান আকার ধারণ করে, পরে নবম শতাব্দীতে দৃঢ়বল ইহার সহিত অনেক অংশ যোজনা করেন। সুশ্রুত সম্ভবত খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর রচনা। পরবর্তীকালে বাগভট (সপ্তম শতাব্দী) ও চক্রপাণিদত্ত (একাদশ শতাব্দী) প্রসিদ্ধ বৈদ্যশাস্ত্র প্রণয়ণ করেন।

মধ্য এশিয়ায় কাশগরের নিকট বাওয়ার সাহেব নবনীতকম্ ও অন্যান্য কয়েকখানি বৈদ্যক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এগুলি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর ভারতীয় অক্ষরে লিখিত এবং সম্ভবতঃ তাহার অনেক পূর্বেই রচিত। ইহাতে আত্রেয়, ক্ষরপাণি জাতুকর্ণ, পরাশর, ভেদ, হারীত এবং সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বৈদ্যকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থগুলিতে আয়ুর্বেদের অনেক প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব তুর্কীস্থানে চর্মের উপর লিখিত একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত এবং ইহাতে দশবিধ রসের আলোচনা আছে। চরক ও সুশ্রুতে মাত্র ছয়টি রসের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তবে ইহাতে প্রাকৃতের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এই সমুদয় হইতে প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় বৈদ্যক শাস্ত্র খৃষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভেই সমগ্র মধ্য এশিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পরবর্তী যুগে খলিফা হারুণ আল রসিদের সময় (৭৮৬-৮০৯ খৃষ্টাব্দ) বৈদ্যশাস্ত্রের খ্যাতি আরব সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হয় এবং চরক সুশ্রুত বাগভটের গ্রন্থগুলি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। হারুণ একবার দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন এবং একজন ভারতীয় বৈদ্য তাঁহাকে নীরোগ

করেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ খলিফা তাঁহাকে রাজধানী বাগদাদের রাজকীয় আরোগ্যশালার (hospital) অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চর্চা কত বহুবিস্তৃত ছিল তাহা নিম্নলিখিত বিভাগগুলি হইতেই বোঝা যাইবে। কায়তন্ত্র (medicine), শল্যতন্ত্র (surgery and midwifery), শালাক্যতন্ত্র (treatment of eye, ear, nose and throat), ভূতবিদ্যা (psychotherapy), কৌমারভৃত্য (pediatrics), অগদতন্ত্র (toxicology), রসায়নতন্ত্র (art of rejuvenation) এবং বাজীকরণতন্ত্র। এ সমস্তগুলিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ইউরোপে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে হার্ভে সর্বপ্রথম রক্তসংবাহনের তথ্য (circulation of blood) আবিষ্কার করেন এবং ইহার অভিনবত্বের জন্য সমসাময়িক বৈদ্য সমাজে নিন্দা ও উপহাসের পাত্র হন। কিন্তু তাহার সহস্র বৎসর পূর্বে চরক সংহিতায় এই তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। জীবাণুতত্ত্বও (pathogenic microbe) আয়ুর্বেদশাস্ত্রকারগণের অজ্ঞাত ছিল না।

শল্য (surgery) সম্বন্ধে আশ্চর্যজনক উন্নতির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীরবৃত্তে (physiology) জ্ঞান লাভ ইহার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। এ বিষয়ে সুশ্রুতের নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। "শল্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইতে হইলে মৃতদেহ যথাযথ ভাবে প্রস্তুত ও ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেহের প্রতি অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।" সুশ্রুতের সময় আর কোনো প্রাচীন জাতির মধ্যে এই প্রকার বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ছিল কিনা তাহা অনুসন্ধানের যোগ্য। শল্যশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে ইহার উপযোগী যন্ত্রাদি ও অস্ত্রোপচারকালে

বেদনা প্রশমনের ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। ক্ষুদ্র জিনিসকে বড় করিয়া দেখিবার জন্য বিশেষ যন্ত্রের কথাও আছে। হস্ত পদ ছেদন, উদর বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্র পরীক্ষা (laparotomy), প্রস্তর নিষ্কাষণ (lithotomy or extraction of stone) এবং মস্তকের অস্থি অপসারণ (trephining) প্রভৃতি বড় বড় অস্ত্রোপচারের বিবরণ সুশ্রুত ও বাগভটের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

শারীরবৃত্ত (physiology) ও জীববিদ্যা (biology) সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তথ্য হিন্দুরা আবিষ্কার করেন। বিপাক (metabolism), সংবহন (circulatory system), রক্তবাহ (vascular system), নার্ভের (nervous system) ক্রিয়া, ভ্রূণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি (foetal development), এবং বংশগতি (heredity) ক্রমে বিশেষ কোনো শক্তি বা বৃত্তির সংক্রমণ (transmission) ইত্যাদি বিষয়ে অনেক গবেষণার পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৬. রসায়ন (Chemistry)

আয়ুর্বেদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় প্রাচীন ভারতবর্ষে রসায়ন শাস্ত্রেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়া এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনার প্রয়োজন নাই। ইউরোপে প্যারাসেলসাস্ (১৪৯৩-১৫৪১ খৃঃ) সর্বপ্রথম খাইবার ঔষধের জন্য পারদের ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরেও ১৫৬৬ খৃস্টাব্দে ফরাসী দেশের পার্লামেণ্ট ও বৈদ্য মণ্ডলী এই ব্যবস্থার নিন্দা করেন। কিন্তু ইহার প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতে পারদ ও লৌহের রাসায়নিক গবেষণা হয় এবং এগুলি বহুল পরিমাণে ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধ নির্মাণে পারদ, লৌহ ও আর্সেনিকের প্রয়োগ ভারতের রসায়ন শাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট অবদান। সুশ্রুত ক্ষার (alkali) ও ক্ষারীয় বিদাহী (alkaline caustics) প্রভৃতির নির্মাণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মৃদুক্ষার ও মধ্যমক্ষারের প্রভেদ এবং লৌহ পাত্রে তাহার রক্ষাকরণ সম্বন্ধে খৃষ্টীয় আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীতে নাগার্জুন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন ইউরোপে একাদশ শতাব্দীর পূর্বে তাহা কেহ জানিত না। খনি (ore) হইতে ধাতু নিষ্কাসন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাহা শুদ্ধ করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করণ এই দুই ব্যবহারিক বিদ্যায় খৃষ্টজন্মের তিনশত বৎসর পূর্বেই যে হিন্দুরা খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। এই শেষোক্ত গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই ভস্মীকরণ (calcination), অধঃপাতন (distillation), স্বেদন (steam distillation), ঊর্ধ্বপাতন (sublimation) এবং স্তম্ভন (fixation) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে হিন্দুগণ বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। চরক ও সুশ্রুত জৈব ও অজৈব যৌগিক (organic and inorganic compounds) সম্বন্ধে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন।

চ. উদ্ভিদবিদ্যা (Botany)

প্রাচীন আযর্বেদে যে বৃক্ষ, লতা, গুল্মের বিশেষ স্থান ছিল জীবকের কাহিনী হইতেই তাহা বেশ বোঝা যায়। এই জন্য প্রাচীনকালে উদ্ভিদবিদ্যার এক নাম ছিল ভেষজবিদ্যা। বৃক্ষায়ুর্বেদও ইহার আর এক নাম ছিল। ইহার অর্থ বৃক্ষের আয়ুসম্বন্ধে জ্ঞান। খুব প্রাচীনকাল হইতেই বৃক্ষের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্র,

বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে গুল্মবৃক্ষায়ুর্বেদ জানিতে হইলে যে সমুদয় বিষয় সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে হইত তাহার নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায়—বীজসংগ্রহ ও নির্বাচন, উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন, বপন, বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম, কলম-কাটা (grafting), চারা লাগান, চারাগাছের যত্ন (nursing), সার দেওয়া, ভিন্ন ভিন্ন শস্য বপন (rotation of crops), সুস্থ এবং পীড়িত চারার পালন, উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ এবং লক্ষণ নির্দেশ ইত্যাদি।

অঙ্কুরোদ্ভেদ (germination) সম্বন্ধে সুশ্রুত লিখিয়াছেন যে উপযুক্ত ঋতু, উত্তম ক্ষেত্র, এবং যথাযথ জলসেচন ব্যতীত ইহা সফল হয় না। বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যার মতেও বায়ু, তাপ ও জল সফল অঙ্কুরোদ্ভেদের প্রধান উপাদান।

বৈদিক যুগে বর্তমানকালের ন্যায় বৃক্ষ, গুল্ম (shrub), কন্দ (herb) প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতাতে উদ্ভিদের প্রধান দুই অংশ মূল ও তূলের (shoot) উল্লেখ করিয়া, তূলের বিভিন্ন অংশ, কাণ্ড (stem), বংস (branch), পুষ্প ও ফলের বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বৃক্ষের স্কন্ধ (trunk), শাখা, ও পর্ণ আছে। পরবর্তী যুগে এই সমুদয় অংশের প্রত্যেকটির বিশদ বিশ্লেষণ এবং বহু শ্রেণীভেদ পাওয়া যায়। বীজের বিভিন্ন অংশেরও বৈজ্ঞানিক বর্ণনা আছে। এই প্রসঙ্গে বীজকোষ (seed coats), শস্য (kernel or endosperm), বীজপত্র (cotyledons) প্রভৃতির বর্ণনা আছে। শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে আম্রবৃক্ষের জীবনবৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে।

উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরের পাঁচটি বিভিন্ন অংশ নির্ণীত হইয়াছিল— (১) ত্বচ্ (skin), (২) মাংস (soft tissues or bast) (৩) অস্থি (wood, or bone) (৪) মজ্জা (pith) এবং (৫) স্নায়ু (fibres

in the bast)। বৃহদারণ্যকোপনিষদে মাংসকে বল্কল (bark) এবং শকর (bast fibres) এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

বৃক্ষের মূল যে মাটির জল শোষণ করিয়া আনে এবং তাহাই যে তাপ ও বায়ুর সাহায্যে কাণ্ডের মধ্য দিয়া পাতায় পৌঁছিয়া খাদ্যে পরিণত হয় এবং বৃক্ষের পুষ্টিসাধন করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে হেলস্ তাহা প্রথমে প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু এই তত্ত্ব বহুকাল পূর্বে হিন্দুরা জানিতেন। গাছের গোড়ায় জল দিলে কি করিয়া গাছের মধ্য দিয়া, কোন প্রকার ঘাত (impulse) সংঘাত (impact) না থাকিলেও ঐ জল উর্ধ্বদিকে প্রসারিত হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে হার্ভে তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন। প্রাচীন হিন্দুরা তত্ত্বটি জানিতেন এবং ব্যাখ্যার চেষ্টাও করিয়াছেন। বৃক্ষের গাত্র হইতে যে স্বেদবিন্দুর মতো রস নির্গত হয় এবং অনেক সময় উহার জ্যোতি থাকে হিন্দুরা সে তথ্যও আলোচনা করিয়া শেষোক্ত শ্রেণীর উদ্ভিদকে জ্যোতিষ্মতী, জ্যোতির্লতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মানুষের ন্যায় উদ্ভিদেরও শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য আছে, তাহাদের স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য আলো, জল ও সার (খাদ্য) প্রয়োজন, এবং খারাপ খাদ্য, পীড়া ও আকস্মিক দুর্ঘটনাই যে তাহাদের মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি বিষয় বিশেষ পরিচিত তথ্য ছিল। হিন্দুগণ ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বৃক্ষলতাদি স্বভাবতঃই যেদিকে অনুকূল আবহাওয়া সেই দিক দিয়াই বাড়ে, এবং যেদিকে ঐরূপ আবহাওয়া নাই সেই দিক হইতে ক্রমশঃ সরিয়া যায়, রাত্রে তাহারা নিদ্রার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে এবং মুদ্রিত পত্রপুটই তাহার চিহ্ন ও প্রমাণ, মানুষের স্পর্শে তাহাদের স্পন্দন হয় এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুষ্প বিকশিত হয়।

ইহার চেয়েও বিস্ময়ের কথা এই যে উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে এবং তাহারা মানুষের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করে বহু প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুরা তাহা বিশ্বাস করিতেন। মনুসংহিতাতে স্পষ্ট লিখিত আছে "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ"। যে আচার্য জগদীশচন্দ্র ইহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগ দানে জগতের বিদ্বানমণ্ডলীকে বিস্মিত করিয়াছেন তিনি যে হিন্দুদের এই প্রাচীন তত্ত্ব জানিতেন এবং তাহা হইতেই প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাভারত, ভাগবতপুরাণ এবং পরবর্তী অনেক গ্রন্থে উদ্ভিদের যে জীবন আছে তাহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আজকাল উদ্ভিদের উৎপত্তি হয় প্রাচীন বৈদ্যক শাস্ত্রে প্রায় তাহার সকল গুলিরই উল্লেখ আছে; যথা বীজরুহ (by seeds), মূলজ (by roots), স্কন্ধজ (by cuttings), স্কন্ধে রোপনীয় (by graftings, layerings), অগ্রবীজ (by apices), পর্ণযোনি (by leaves) এবং সৌনরুঢ়জ। বৃহৎসংহিতা, অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, অভিধানচিন্তামণি, সুমঙ্গলবিলাসিনী প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এই সমুদয় প্রণালীর নিদর্শন পাওয়া যায়। উদ্ভিদের মধ্যেও যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে ইহাও কেহ কেহ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। পুং-কেতকীকে বলা হইত সিতকেতকী, বিফলা, অথবা ধূলিপুষ্পিকা, এবং স্ত্রী কেতকীর নাম ছিল স্বর্ণকেতকী।

উদ্ভিদের নামকরণেও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সার উইলিয়ম জোন্স্ লিখিয়াছেন যে লিনিয়াস যদি সংস্কৃত জানিতেন তাহা হইলে ভারতীয় নামই গ্রহণ করিতেন। নামকরণে যে সমুদয় নীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহার নিম্নলিখিতরূপ বিশ্লেষণ করা যায়।

১। বিশিষ্ট কোনো ঘটনা বা ব্যক্তির সংসর্গ—
বোধিদ্রুম, অশোক, শিবশেখর, যজ্ঞডুমুর।

২। বিশিষ্ট ধর্ম (ক) ভেষজ—দদ্রুঘ্ন, অর্শোঘ্ন।
(খ) সাংসারিক ব্যবহার—বাণীর, দন্তধাবন, লেখন, কার্পাস।

৩। বিশিষ্ট প্রকৃতি—ফেনিল, বহুপাদ, চর্মিণ।

৪। বিশিষ্ট গঠন—ত্রিপত্র, কীশপর্নী, পঞ্চাঙ্গুল, হেমপুষ্প, শতমূলী শতপর্বিকা।

৫। ভৌগোলিক সংসর্গ—সৌবীর, চাম্পেয়, মাগধি, ওড্রপুষ্প।

৬। প্রাকৃতিক সংসর্গ—নদীসর্জ, জলজ, মরুবক।

৭। ঋতু সংসর্গ—শীতভীরু, মাঘ্য, শারদী।

অনেক সময় উদ্ভিদের একাধিক নাম থাকিত—একটি সাধারণ, অপরটি কোনো বিশিষ্ট গুণজ্ঞাপক। যেমন বক্রপুষ্প ব্রণের ঔষধ বলিয়া ইহার নাম ছিল ব্রণারি, চিত্রবীজের নাম ছিল বাতারি ইত্যাদি।

শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধেও এইরূপ একাধিক প্রণালী ছিল।

(ক) উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ—

১। বনস্পতি—যাহার ফল হয় ফুল হয় না।

২। বানস্পত্য অথবা বৃক্ষ—যাহার ফুল, ফল দুইই হয়।

৩। ওষধি—যে গাছ একবার ফল দিয়া মরিয়া যায় যেমন—
ধান, কলা প্রভৃতি।

৪। বীরুধ, লতা—যাহা মাটিতে বিস্তার লাভ করে অথবা গাছের গায়ে জড়াইয়া ওঠে।

৫। গুল্ম—ঝাড়যুক্ত ছোট গাছ, বিশেষতঃ যাহার কাণ্ড রসাল।

৬। তৃণ—ঘাস, বংশ ইত্যাদি।

বৃক্ষরুহ (epiphyte) এবং বৃক্ষাদনীর (parasite) উল্লেখ আছে।

জলনীলী (algae) এবং ছত্রা (mushroom) উদ্ভিদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। উদ্ভিদের গণ (genus) ও প্রজাতি (species) অনুসারে বিভাগও কিছু কিছু পরিলক্ষিত হয়। যেমন কোবিদার ফুলের রং অনুসারে শ্বেত, রক্ত ও পীত এই তিন প্রজাতিতে বিভক্ত। বলার চারিটি প্রজাতি,—বলা, অতিবলা, মহাবলা, নাগবলা।

(খ) ভৈষজ্য গুণ অনুসারে চরক উদ্ভিদের দুই প্রধান শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—বিরেচন (purgatives) ও অনুপান (astringents)। প্রথমটির সংখ্যা ৬০০ এবং দ্বিতীয়টির ৫০০। এগুলির মধ্যে আবার ৫০, ১০ প্রভৃতি লইয়া ছোট ছোট বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। সুশ্রুত সমুদয় উদ্ভিদকে মোট ৩৭টি গণে বিভক্ত করিয়াছেন।

(গ) আহারের উপযোগিতা অনুসারে চরক উদ্ভিদের ছয়টি এবং সুশ্রুত পনেরটি বিভাগ করিয়াছেন। চরকের ছয় বর্গের নাম শুকধান্য (cereals), শমীধান্য (pulses), শাক (potherbs), ফল, হরিত (vegetables) এবং ইক্ষু।

উদ্ভিদের বীজের মধ্যে যে ইহার সমস্ত যন্ত্র (organ) ও কলার (tissue) অংশ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বর্তমান এবং ইহার ফলেই ইহা হইতে অনুরূপ উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। উদ্ভিদের অনিষ্টকারী কীট ও ছত্রাক (fungus) জনিত পীড়া প্রভৃতির লক্ষণ, উপশমের উপায় প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। উদ্ভিদের প্রকৃতি পরিবর্তন, যেমন নির্গন্ধ পুষ্পকে সুগন্ধি করা, কার্পাস বৃক্ষে নানাবর্ণের তূলা উৎপাদন করা প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুরা গবেষণা করিতেন এবং কিছু ফললাভও করিয়াছিলেন।

হিন্দু যুগে উদ্ভিদবিদ্যার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত শার্ঙ্গধরপদ্ধতির অন্তর্গত উপবনবিনোদ নামক খণ্ডে

তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে উদ্ভিদবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিত ও বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ছ. পদার্থবিদ্যা (Physics)

খুব প্রাচীনকালেই হিন্দুরা পদার্থবিদ্যার কয়েকটি দুরূহ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সকল পদার্থই যে কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি মাত্র, বায়ু তরঙ্গের মধ্য দিয়া যে শব্দের প্রসারণ হয়, আলোক ও তাপ যে একই শক্তির বিভিন্ন রূপ মাত্র, বর্তমান বিজ্ঞানের এই সমুদয় বিস্ময়কর তত্ত্ব অথবা তাহার পূর্বাভাস যে কণাদ কর্তৃক দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। গতি ও শ্রুতির মূল তত্ত্বগুলি (theories of motion and acoustics) সম্বন্ধেও প্রাচীন হিন্দুগণ উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক ধারণা পোষণ করিতেন। যে কোনো পদার্থ জলের মধ্যে রাখিলে তাহা যে তুল্য ওজনের জলের স্থান অধিকার করে এই নীতি আবিষ্কার করিয়া আর্কিমিডিস্ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। অনেকেরই ধারণা, এমন কি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুরা এই তত্ত্ব জানিতেন না। কিন্তু ভারতের একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থের চীনদেশীয় ভাষায় অনুবাদে (মূল গ্রন্থ আর এখন পাওয়া যায় না) একটি গল্প আছে, তাহা পড়িলে মনে হয় যে, এই তত্ত্বটিও হিন্দুদের অজ্ঞাত ছিল না। গল্পটি এই। এক রাজার অহঙ্কার দূর করিবার জন্য একটি প্রেত তাঁহাকে অনেকগুলি কঠিন কঠিন প্রশ্ন করে। এই রাজার একটি প্রিয় হস্তী ছিল। একদিন প্রেত রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল এই হাতীটির ওজন কত। রাজা ইহা স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রীদের ডাকিলেন। মন্ত্রীরাও ইহার উত্তর দানে অপারগ হইলেন। অবশেষে এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রকাশ্যে

বহু পুরস্কার ঘোষণা করা হইল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। প্রধান মন্ত্রী বিষণ্ণ মুখে তাঁহার পিতার নিকট এই সঙ্কটের বিবরণ দিলেন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন যে একখানি নৌকার উপর হাতীটিকে দাঁড় করাইয়া নৌকার কতটা জলে ডুবিয়া যায় তাহা চিহ্নিত করিয়া রাখ। তারপর হাতীটাকে নামাইয়া ঐ নৌকায় পাথর চাপাইতে থাক। এই ভাবে যখন দেখিবে যে পূর্বের চিহ্ন পর্যন্ত নৌকা জলে ডুবিয়াছে তখন পাথরগুলির ওজন করাইবে। যে ওজন পাইবে হাতীরও সেই ওজন জানিবে।

এইরূপ আর একটি প্রাচীন গল্পে প্যারাসুটের অন্তর্নিহিত তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সানুদাস নামক একজন দুঃসাহসিক বণিক বাণিজ্য উপলক্ষে কিরূপে নানা দুরধিগম্য স্থানে ভ্রমণ করিত এই গল্পে তাহা বিবৃত হইয়াছে। একবার ঘটনাচক্রে সে এমন একটি পাহাড়ের শিখরে উপস্থিত হইল যেখান হইতে নামিবার কোনো উপায় নাই। তখন একটি বড় ছাতা খুলিয়া সে তাহার দণ্ডটি হাতে ধরিয়া লাফ দিল এবং ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। ইহা ছত্রপথ নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই সমুদয় গল্প হইতে দেখা যায় যে পদার্থের বিশেষ ধর্ম বা শক্তি (property) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা হিন্দুদের মনে ছিল এবং তাঁহারা কোনো কোনো সমস্যার সমাধানও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কি প্রণালীতে কোন্ সময়ে এই সমুদয় সমাধান করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম (general principles) স্থির করিতে পারিয়াছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। তবে এইদিকেও যে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল তাহার প্রমাণ আছে। উদয়ন তাঁহার কিরণাবলী গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বায়ুর কোনো ওজন নাই। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে খুব পাৎলা আচ্ছাদনের

বেলুন অথবা ব্ল্যাডার (Bladder) যদি হাওয়া ভরিয়া ফুলাইয়া ওজন করা যায় তবে খালি বেলুনের ওজনের সহিত তাহার কোনো প্রভেদ দেখা যায় না। তারপর তিনি বলিয়াছেন যে উক্ত বেলুনে ধূম পুরিয়া দিলে তাহা আকাশে ওঠে; সুতরাং মনে হইতে পারে যে ধূম বাতাসের চেয়ে হাল্কা, অতএব বাতাসের ওজন আছে। এই আপত্তির উত্তর স্বরূপ তিনি বলেন যে বায়ু অথবা ধূম কাহারও ওজন নাই। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অবশ্য ভুল, কিন্তু তিনি যে পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সেকালের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির প্রভাব বিশেষ ভাবে সূচিত করে। সেকালে ওজন করিবার সূক্ষ্ম যন্ত্র থাকিলে তিনি হয়তো আবিষ্কার করিতে পারিতেন যে এমন অনেক ধূম (গ্যাস) আছে যাহা বাতাসের চেয়েও হাল্কা। এই অভিনব বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের খুব কাছাকাছি আসিয়াও তিনি বা তাঁহার পরবর্তী অন্য কেহ আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ভাস্করাচার্য লিখিয়াছেন যে পৃথিবী অন্তরীক্ষের যাবতীয় বস্তুকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। সুতরাং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (gravity) সম্বন্ধে তাঁহার কিছু কিছু ধারণা জন্মিয়াছিল—যদিও তিনি ইহার মূলসূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। শক্তির (energy) নিত্যতা (conservation), পরিবর্তন (transformation) এবং অপব্যয় (dissipation), এবং ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত অভিব্যক্তি বাদ (principle of evolution) সম্বন্ধেও অনেক তত্ত্ব খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে উদ্‌ভূত হইয়াছিল।

জগতে অহরহ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম অনুসারেই হয় এবং মানুষের পক্ষে সেই সমুদয় নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ইহাই মূল প্রেরণা। প্রাচীন ভারতে ইহা যে কিরূপ প্রবল ছিল বরাহমিহিরের একটি উক্তি হইতে

তাহা প্রমাণিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে খাদ্য দ্বারা জীবনধারণ হয় এবং খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, সুতরাং যে কোনো উপায়েই হউক বৃষ্টিপাতের সাধারণ নিয়মগুলি আবিষ্কার করা আবশ্যক। অতঃপর গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ, বৎস প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণ এ বিষয়ে কি আলোচনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন। এখানে বলা আবশ্যক যে সে যুগে বৃষ্টি-জলের পরিমাণ মাপিবার যন্ত্র (rain-gauge) ছিল এবং কোন্ দেশে বৎসরে কিরূপ বৃষ্টি হয় তাহার নিয়মিত বিবরণ থাকিত।

বরাহমিহিরের আর একটি উক্তিও উল্লেখযোগ্য। "কেহ কেহ মনে করেন বলাসুর ও দধীচির অস্থি দিয়া মণি নির্মিত হয়, কিন্তু অন্য কেহ কেহ আবার বলেন যে, ইহা স্বাভাবিক প্রস্তরের পরিণতি মাত্র।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া বরাহমিহির ২২টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মণির বর্ণনা এবং তাহাদের ধর্ম (property) নির্দেশ করেন।

বরাহমিহির শিলাদারণ (searing of hard rocks, শস্ত্রপান (hardening of steel), বজ্রলেপ (preparation of cements) প্রভৃতি ক্রিয়ার বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর নির্দেশ দেন নাই। তৎকালে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাচ (glass) নির্মিত হইত এবং ভারতের ইস্পাত জগদ্বিখ্যাত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত একটি লৌহস্তম্ভ দিল্লীর কুতুবমিনারের নিকটে এখনও বর্তমান আছে। ইহা ২৪ ফুট উচ্চ এবং ইহার ওজন প্রায় ১৭৫ মণ। এরূপ বৃহৎ লৌহখণ্ড ঢালাই করা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপেও সম্ভবপর ছিল না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই স্তম্ভগাত্রে কোনোরূপ মরিচা বা অন্য কোনোও দাগ পড়ে নাই। সুতরাং দেড় হাজার বছরের রৌদ্র বৃষ্টি এই লৌহের উপর কোনোই প্রভাব বিস্তার করিতে

পারে নাই। সেকালে ধাতু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চর্চার যে কতদূর উন্নতি হইয়াছিল এই সমুদয় হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

পদার্থবিদ্যার অনেকগুলি মূল্যবান তত্ত্বের সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুদের বিশিষ্ট জ্ঞান ছিল। ইহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

১। আলোকের প্রতিফলন (reflection) ও প্রতিসরণ (refraction) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা।

২। আলোকের রাসায়নিক ক্রিয়া (chemical effects)।

৩। সূর্যের রশ্মি ফোকস্ (focus) করিয়া দাহ্য দ্রব্য প্রজ্বালন অর্থাৎ লেন্‌সের (lens) মূল নীতি।

৪। তারের কম্পন (vibration of strings) সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম।

৫। চৌম্বক আকর্ষণ (magnetic attraction)। চুম্বকনের (magnetization) মূল কারণ নির্দেশ করিতে না পারিলেও হিন্দুরা ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। অয়স্কান্ত পাথর যে লৌহ আকর্ষণ করে এবং অ্যাম্বার (amber) দ্বারা তৃণ ও খড় আকৃষ্ট হয় ইহা তাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রযাত্রী জাহাজে দিক নির্ণয়ের জন্য 'মৎস্য-যন্ত্র' ব্যবহৃত হইত। ইহা তৈলপূর্ণ পাত্রে রক্ষিত হইয়া সর্বদা উত্তরদিক নির্দেশ করিত।

জ. অন্যান্য বিভাগ

প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও যে হিন্দুরা ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও রীতিমত অনুসন্ধান হয় নাই। উমাস্বাতী (আঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) জীবজন্তুর যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহাতে বেশ বোঝা

যায় যে এ সম্বন্ধে সেকালে খুব চর্চা ছিল। সুদীর্ঘকাল ব্যবধানে যে পৃথিবীর অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয় ভূবিদ্যার এই তত্ত্বও হিন্দুরা জানিতেন। ধাতুর খনি সম্বন্ধে প্রাচীন নানা গ্রন্থে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে তাহা হইতেও ভূবিদ্যা-চর্চার আভাস পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অন্য প্রসঙ্গে কিছু কিছু বলা হইয়াছে।

৪. বিদেশীয় সভ্যতার নিকট ভারতের ঋণ

এককালে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে হিন্দুরা বৈজ্ঞানিক যে সমুদয় তথ্য জানিত তাহার প্রায় সকলই বিদেশ হইতে শিখিয়াছিল। তাঁহাদের মতে গ্রীসই ছিল সমুদয় জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস এবং ইহার নিকটই ভারতবর্ষ বিশেষভাবে ঋণী ছিল। তবে গ্রীক সভ্যতা উদ্ভবের পূর্বে ব্যাবিলন মিশর প্রভৃতি দেশের নিকট হইতেই হিন্দুরা বৈজ্ঞানিক তথ্য শিখিয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভাবের ও চিন্তার আদান প্রদান আবহমান কাল হইতে প্রচলিত। কিন্তু ইহার স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। কোনো দুই দেশে কোনো বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিলেই তাহা যে ভাব বিনিময়ের ফল মাত্র একথা সিদ্ধান্ত করা চলে না। কারণ অনুরূপ পরিবেশের ফলে বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্রভাবে একই প্রকারের চিন্তা ও আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে একে অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলেও এ দুয়ের মধ্যে কে কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করাও সকল সময়ে সুসাধ্য নহে। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে এরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দুরাই সর্ববিষয়ে অন্যের নিকট ঋণী।

এই মনোবৃত্তির পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত সাইন (sine) ইহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গ্রীকেরা যে ইহার ব্যবহার জানিত এরূপ কোনো প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতে ইহার প্রচলন ছিল। তথাপি ইউরোপীয় কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা যে হিন্দুরা গ্রীকগণের নিকট হইতেই ইহা শিক্ষা করিয়াছিল। হিন্দুরা ২৭টি নক্ষত্র মণ্ডলের সহিত পরিচিত ছিল। বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতে হিন্দুরা ইহা আরব, চীন, অথবা ব্যাবিলনের নিকট হইতে শিখিয়াছিল। কিন্তু যে যুগে হিন্দুরা নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিল সে যুগে আরব সভ্যতার অস্তিত্ব অথবা চীন দেশের সহিত ভারতের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। কিথ্ সাহেব ইহা মানিয়া লইয়া বলিলেন যে অতএব হিন্দুরা ব্যাবিলনের নিকট হইতেই নক্ষত্রের পরিচয় পাইয়াছিলেন ইহাই সর্বাপেক্ষা সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও স্বীকার করিলেন যে প্রাচীন ব্যাবিলনে যে ২৭ নক্ষত্রমণ্ডলীর ধারণা প্রচলিত ছিল তাহার স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নাই। ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

বিশিষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে দশমিক অঙ্কপাতন প্রণালী হিন্দুদেরই সৃষ্টি। কিন্তু সামান্য সাদৃশ্য দেখিয়াই কণাদের পরমাণুবাদ যে গ্রীক এম্পেডোক্লিসের মত হইতে গৃহীত ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলার দেখাইয়াছেন যে এ দুয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ বর্তমান।

প্রাচীন হিন্দুগণ যে যবনদের নিকট হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। অন্যের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে তাঁহারা কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।

এবং ইহার মধ্যে দোষের কথাও কিছু নাই। কারণ বিভিন্ন মনুষ্য গোষ্ঠির পরস্পর ভাব ও জ্ঞানের আদান প্রদানের ফলেই মানুষের বিরাট সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া কোন্ তথ্য কে প্রথমে আবিষ্কার করিল ইহা স্থির করার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কিন্তু ইহার জন্য যে অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন বর্তমানে তাহার একান্ত অভাব। বিশেষতঃ এ বিষয়ে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে যে সমুদয় তথ্য জানা আবশ্যক তাহার অধিকাংশই এখনও আমাদের জানা নাই। সুতরাং বিজ্ঞান জগতে প্রাচীন হিন্দু অথবা গ্রীকের মৌলিকত্ব কত তাহা নির্ণয় করিবার সময় এখনও হয় নাই। এই জন্যেই এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় এই গ্রন্থে তাহা যথাসাধ্য বর্জন করিয়াছি।

৫. উপসংহার

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে যে অনুসন্ধিৎসা, অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের মূল তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা, এবং যুক্তিমূলক মনোবৃত্তি বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি, ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাহা বিদ্যমান ছিল। এবং ইহার ফলে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে হিন্দুরা যে সমুদয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা গ্রীস অথবা সমসাময়িক প্রাচীন অন্য কোনো দেশের তুলনায় কোন অংশেই হীন নহে। বর্তমানকালে সাধারণের ধারণা এই যে হিন্দুরা দার্শনিক চিন্তায় উচ্চস্থান অধিকার করিলেও বৈজ্ঞানিক জগতে তাহাদের কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল না ; এবং গ্রীস যে যুক্তিমূলক মনোবৃত্তির উদ্ভাবন করিয়া জগতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ প্রশস্ত

করিয়াছে প্রাচীন ভারতে তাহার একান্তই অভাব ছিল। এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত এবং অজ্ঞতার ফলমাত্র তাহাও এই আলোচনা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

প্রাচীন জগতের বিজ্ঞানের ইতিহাসে ভারতের কোনো স্থান নাই। এ সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণ বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ ভারতের কোনো উল্লেখ করেন নাই। এই অজ্ঞানতা দূর করা আবশ্যক। এবং ইহা করিতে হইলে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে কি উন্নতি হইয়াছিল তাহার সবিশেষ আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু এই কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। কারণ এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রাচীন ভারতের ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস, এবং বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত বিশিষ্টভাবে পরিচিত হইতে হইবে। কিন্তু এদেশে এমন লোক খুব কমই আছেন যিনি এই সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞ। মনস্বী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ বিষয়ে যে পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন এ যাবৎ কেহই তাহা অনুসরণ করেন নাই। কারণ তাঁহাদের মত একাধারে পূর্বোক্ত সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এদেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকরা অনেকেই গ্রীক-ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাবা বিজ্ঞানের ইতিহাসে গ্রীসের যথাযথ স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক তাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, এবং যাঁহারা সংস্কৃতে পণ্ডিত তাঁহারা বিজ্ঞানের ধার ধারেন না। সুতরাং প্রাচীন জগতে বিজ্ঞানের ইতিহাসেও হিন্দুদের যে বিশিষ্ট স্থান আছে এদেশীয় বা বিদেশীয় পণ্ডিতগণ তাহার কোনো সংবাদই রাখেন না।

সুখের বিষয় সম্প্রতি এ সম্বন্ধে লোকের মনে ঔৎসুক্য জাগিয়াছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী নগরীতে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য কয়েকজন

বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি সভা আহূত হয়। কিন্তু তারপর এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনো চর্চা হইয়াছে বলিয়া জানি না।

স্বাধীন ভারতে চারিদিকেই প্রাচীন হিন্দুগণের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় লাভের আগ্রহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুর বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা না হইলে এই সংস্কৃতির বিবরণ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

এই দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি রচনার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিক নহি, এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেও পারদর্শী নহি। সুতরাং নানা লোকের লেখা হইতে সংকলন করিয়া একটি মোটামুটি বিবরণ লিখিয়াছি মাত্র। এই কার্য উপযুক্তভাবে করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতজ্ঞের একযোগে কাজ করিতে হইবে। ইহার জন্য চাই একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং বহু বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে ইহা গড়িয়া উঠিবে এবং প্রাচীন ভারতের সভ্যতার এক অন্ধকার দিক উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইবে।

প্রমাণপঞ্জী

1. Seal, B. N., *Positive Sciences of the Ancient Hindus*

2. Ray, P. C., *History of Hindu Chemistry*

3. Majumdar, R. C. and Altekar, A. S., *The Vakataka —Gupta Age*, 1954, pp. 379-89

4. *Symposium on History of Sciences in South Asia*, Reprinted from the Proceedings of the National Institute of Sciences of India vol, xviii. No. 4, 1952

5. *The Cultural Heritage of India*, vol. iii Sri Ramakrishna Centenary Committee, Belur Math, Calcutta : See the following articles—

Hindu Astronomy by P. C. Sen Gupta ; Vedic Mathematics by B. B. Dutta ; The Spirit and Culture of Ayurveda by M. M. Gananath Sen ; Botany in India—Past and Present by G. P. Majumdar ; India's Contribution to Chemical knowledge by N. R. Dhar.

6. *Cambridge Ancient History*

7. Farrington, *Science in Antiquity*

8. Sarkar, B. K., *Hindu Achievements in Exact Science*, Longmans, 1918

9. Mukhopadhyaya, Girindranath, *History of Indian Medicine*, Calcutta University ; 1911

10. Majumdar, G. P., *Vanaspati Plants and Plant life as in ancient treatises and traditions*, Calcutta University, 1927

11. Dampier, Sir William Cecil, *The History of Sciences*, Cambridge University Press, 1942

12. Sarton, George, *Introduction to the History of Science*, Carnegie Institute, 1927

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চম মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* সচিত্র

* সচিত্র

*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর
৬৬। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৬৭। শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬৮। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০। সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৭১। দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২। তেল আর ঘি ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৭৩। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী
৭৪। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৭৫। বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
৭৬। বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*৭৭। সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন
*৭৮। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৭৯। ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮০। ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮২। বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৮৩। বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায
*৮৪। সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৫। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৮৬। গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৭। রসাঞ্জন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৮৮। নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক
৮৯। সরল ন্যায় ॥ শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
৯০। খাদ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা
৯১। ওড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
৯২। অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৩। জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
৯৪। ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৯৫। মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়
৯৬। বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

*সচিত্র

*৯৭। জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
৯৮। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৯৯। ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
১০০। সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০১। ধনুর্বেদ ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
*১০২। সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
১০৩। তন্ত্রকথা ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
১০৪। বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*১০৫। কুইনিন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
১০৬। গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত
১০৭। বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
১০৮। সৌন্দর্যদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী
১০৯। পোর্সিলেন ॥ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু
১১০। কয়লা ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার
*১১১। পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
১১২। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
১১৩। বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ॥ শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
*১১৪। ডাকের কাহিনী ॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়
*১১৫। হীরকের কথা ॥ শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত
১১৬। পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
১১৭। নবযুগের ধাতুচতুষ্টয় ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
১১৮। হিন্দু আইনে বিবাহ ॥ শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
১১৯। বুদ্ধ-প্রসঙ্গ ॥ মহেশচন্দ্র ঘোষ
১২০। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা ॥ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

* সচিত্র

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয়	১॥
ইতিহাস	২॥০, ৩৲

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ	২।০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা	২।০

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথ্বীপরিচয়	১।০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব	২।০

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আহার ও আহার্য	১।০

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা	১॥০

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস	২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারত-দর্শনসার	৩।০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির পরাজয়	১॥০
পদার্থবিদ্যার নবযুগ	৩৲

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের গড়ন	২॥০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

হিউএনচাঙ	২॥০, ৩৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পূজাপার্বণ	৩৲, ৪৲